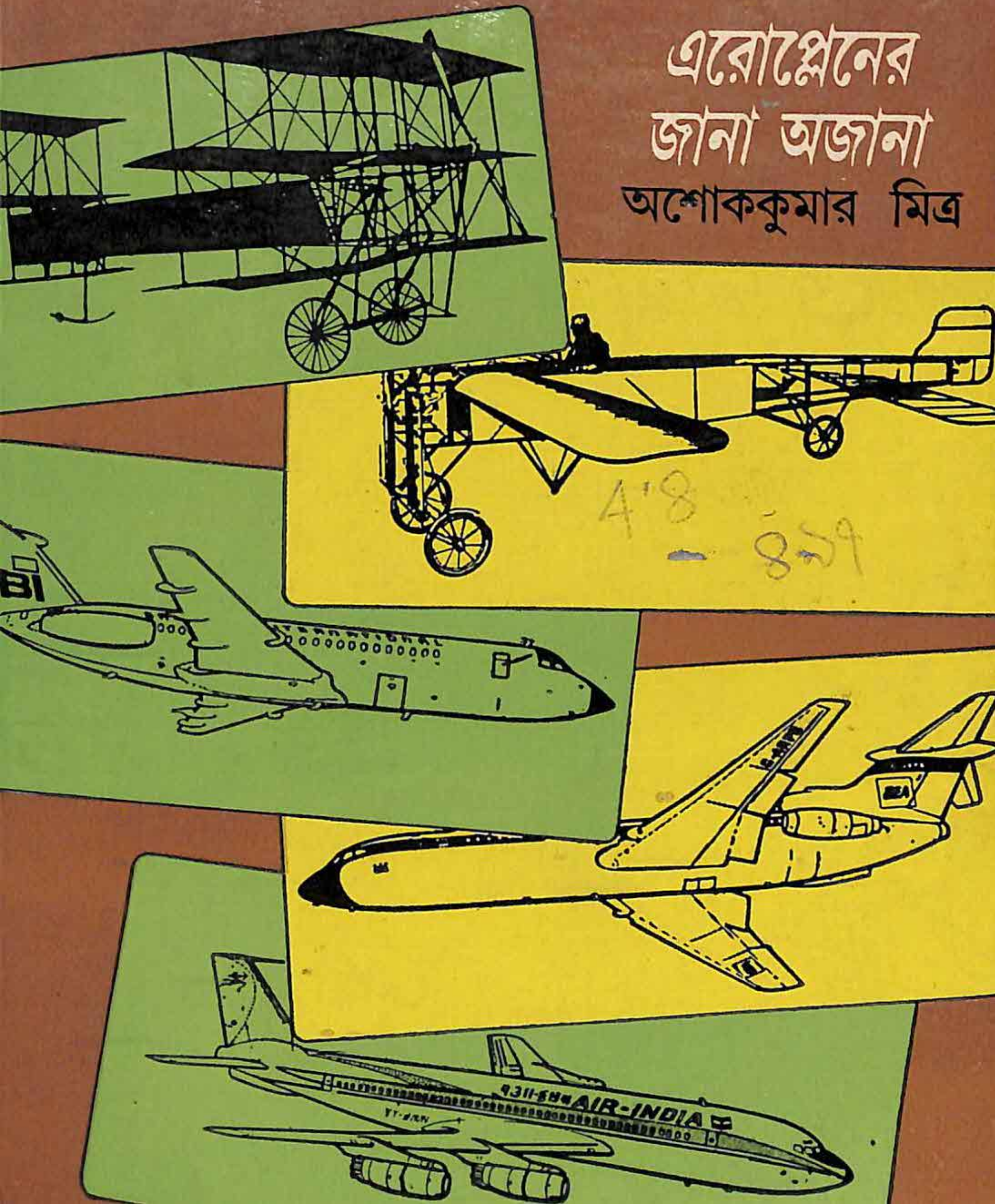
এরোপ্লেনের জানা অজানা

অশোককুমার মিত্র



এরোপ্লেনের জানা অজানা

এরোপ্লেনের জানা অজানা

অশোককুমার মিত্র

আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড
কলকাতা ৯

প্রথম সংস্করণ জানুয়ারী ১৯৮২ দ্বিতীয় মুদ্রণ অগস্ট ১৯৮৭

প্রচ্ছদ প্রবীর সেন

আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে ফণিভূষণ দেব কর্তৃক
৪৫ বেনিয়াটোলা লেন কলিকাতা ৭০০ ০০৯ থেকে প্রকাশিত এবং
আনন্দ প্রেস এ্যান্ড পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে
দ্বিজেন্দ্রনাথ বসু কর্তৃক পি ২৪৮ সি. আই. টি. স্কীম
নং ৬ এম কলিকাতা ৭০০ ০৫৪ থেকে মুদ্রিত।

মূল্য ১০.০০

স্ত্রী শ্রীমতী শান্তি মিত্রকে

ভূমিকা

এরোপ্লেন বিষয়ে আমাদের দেশের ছেলেমেয়েদের কৌতূহলী এবং জিজ্ঞাসু মনের খোরাক জোগাবার জন্য যথাসাধ্য সহজ সরল করে অনেকদিন আগে বাংলায় কয়েকটি গল্প, প্রবন্ধ লিখেছিলাম 'শিশুসাথী' মাসিক পত্রিকায়। সেগুলোকে একত্রিত করে আশুতোষ লাইব্রেরী থেকে 'এরোপ্লেনের গল্প' প্রকাশিত হয়। পরে অনেকের অনুরোধে এবং আগ্রহে এরোপ্লেন নিয়ে আরও অনেকগুলি গল্প-কাহিনী বিভিন্ন পত্রিকায় (যেমন শিশুসাথী, শুকতারা, মৌচাক, গল্পভারতী ও রবিবাসরীয় আনন্দবাজার) লিখি। এইগুলোই এক জায়গায় করে বর্তমান বইটি।

ছোটদের জন্য বিজ্ঞানের গল্প-কাহিনী লেখবার জন্য শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক চারুচন্দ্র ভট্টাচার্য মহাশয় আমাকে যথেষ্ট উৎসাহ ও প্রেরণা দেন এবং লেখা পড়ে উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেন। কৃতজ্ঞতার সহিত তাঁকে আজ স্মরণ করি।

বি, এফ্ ১২০
সল্ট লেক, কলকাতা-৬৪ — শ্রীঅশোককুমার মিত্র
ডিসেম্বর, ১৯৮১

সূচীপত্র

এরোপ্লেনে ইংলিশ চ্যানেল প্রথম পাড়ি

দুশো পাঁচশো বছর আগেকার কথা কিন্তু নয়। এই সেদিনের কথা। অতীত ইতিহাসের এ কোনো গল্পকথা নয়। বরং বলবো বর্তমানকালের এ এক ঐতিহাসিক রোমাঞ্চকর দুঃসাহসিক অভিযানের অপূর্ব কাহিনী।

২৫শে জুলাই, ১৯০৯ সাল। রবিবার।

ভোর হলো বলে। পুব আকাশে দিনের আলোর পূর্বাভাস। পাতলা মেঘে আকাশ যেন কিছুটা থম্‌কে আছে। ভোর হবার আগেভাগেই এক ফরাসী যুবক বৈমানিক লুই ব্লিরিও তার ছোট্ট মনোপ্লেনের পাশে দাঁড়িয়ে পুবদিকে তাকিয়ে যেন সূর্যের স্তব করছেন। জায়গাটা ইংলিশ চ্যানেলের ডোভার স্ট্রেটের এপাশে ফ্রান্সের মাটি ক্যালে। মতলব, এরোপ্লেনে ইংলিশ চ্যানেল প্রথম পাড়ি দিয়ে বাজি জিতবেন। দিনের আলোয় সকলের চোখের সামনে যিনি এরোপ্লেনে প্রথম ইংলিশ চ্যানেল পাড়ি দিতে পারবেন, তাঁকে এক পত্রিকা অফিস এক হাজার পাউণ্ড পুরস্কার দেবে বলে প্রতিশ্রুত। আজকের দিনে এটা ছেলেখেলা মনে হলেও এই সেদিন, ১৯০৯ সালে এই অভিযান ছিল দুঃসাহসিক সন্দেহ নেই। সেধে মৃত্যু ডেকে নিয়ে আসারই নামান্তর। কারণটা বলি।

এই পুরস্কার পাবার জন্য প্রথম চেষ্টা করলেন আর এক ফরাসী যুবক বৈমানিক। নাম তাঁর হিউবার্ট লেথাম। সেদিনটা ছিল সোমবার, ১৯শে জুলাই, ১৯০৯ সাল। তখনও ভাল করে ভোর হয়নি! ঝক্‌ঝকে পরিষ্কার আবহাওয়া। ক্যালের কাছে স্যান্‌গেট থেকে টেক-অফ করলেন লেথাম। ক্যালের আকাশে এক টুকরো মেঘ পর্যন্ত দেখা যাচ্ছে না। লেথামের মনোপ্লেনের ইঞ্জিন বেশ সুন্দর কাজ করছে। জলে পড়ে না গেলে আধ ঘণ্টার কিছু বেশী লাগবে এই প্রায় বাইশ মাইল পথ পাড়ি দিতে। এরোপ্লেনের কোন বিপদ-আপদ হয়ে লেথাম যদি জলে পড়ে যান, তাঁকে উদ্ধার করার জন্য হারপুন নামে একখানা ফরাসী টরপেডো বোটের ব্যবস্থা করা হয়েছিল। এরোপ্লেনে করে এতখানি জলপথ অতিক্রম করার কথা কেউ ভাবতেই পারতো না তখন।

হারপুন চলেছে দুলতে দুলতে। লেথামের মনোপ্লেন উড়ে চলেছে আকাশপথে। কিছুটা এগিয়ে যাবার পর হঠাৎ ছেঁড়া ছেঁড়া মেঘ এসে গেল। লেথামের প্লেনখানা মেঘের মধ্যে মিলিয়ে গেল। কিছুক্ষণ পরে আবার মেঘের আড়াল থেকে বেরিয়ে এল সেটা। সামনে আবার মেঘের রাজ্য! দ্বিতীয়বারও লেথাম মেঘের মধ্যে মিলিয়ে গেলেন। কিন্তু এবার আর তাঁকে মেঘের মধ্যে থেকে বেরিয়ে আসতে দেখা যাচ্ছে না কেন? হারপুনের লোকেরা অধীর আগ্রহে পল গুণতে লাগলেন। এদিক-ওদিক নজর রেখে হারপুন এগিয়ে চললো। মেঘের রাজ্যে ঢুকে লেথামের প্লেন বিগড়ে যায়—সেখান থেকেই প্লেনসুদ্ধ লেথাম জলে পড়ে গিয়েছেন। জলের ওপর পড়ে

লেথামের প্লেনের কাঠামোটা ভাসছিল। হারপুন বরাতজোরে একটু পরেই এই ভাঙ্গা প্লেনখানাকে দেখতে পায়। আশ্চর্য হয়ে দেখে, লেথাম সেই ভেসে-থাকা প্লেনের ওপর বসে একটি সিগারেট খাচ্ছেন! আকস্মিক এই বিপদে এতটুকু বিচলিত হননি তিনি। সমস্ত ব্যাপারটাই যেন মস্ত বড় একটা তামাসা তাঁর কাছে!

লেথাম ইংলিশ চ্যানেল পার হতে পারলেন না। যাই হোক, জলের ওপর বিগড়ে-যাওয়া প্লেন নিয়ে খুব দক্ষতার সঙ্গে নেমে পড়েছিলেন তিনি, তাই তাঁর ভাঙ্গা প্লেনখানা জলের ওপর ভাসছিল। একটু এদিক-ওদিক হলেই তাঁর যে সলিল-সমাধি হত সে বিষয়ে কোন সন্দেহই ছিল না।

উদ্ধার করে লেথামকে আবার ক্যালেতে নিয়ে আসা হল। নেমেই তিনি প্যারিসে ছুটলেন। আরও একখানা প্লেন যোগাড় করে আরও একবার চেষ্টা করে দেখতে হবে এই বাজি জেতবার। যত শীঘ্র সম্ভব। কিন্তু তা আর হয়ে উঠলো না।

ছ'দিন পরেই ব্লিরিও বাজি মাত করে দিলেন।

পুব আকাশের দিকে তাকিয়ে অধীর আগ্রহে ব্লিরিও শুধালেন—"সূর্য উঠছে নাকি?"

এরোড্রোম কর্তৃপক্ষ জানালো, "হ্যাঁ, এইবার আপনি টেক্-অফ্ করতে চান তো করতে পারেন।"

সাধারণত আকাশ খুব পরিষ্কার ঝকঝকে থাকলে ক্যালে থেকে ডোভারের তীর, সমুদ্রের ওপারে আবছা-আবছা দেখা যায়। দূরত্ব মাত্র বাইশ মাইল তো। সেদিন কিন্তু ডোভার একেবারেই দেখা

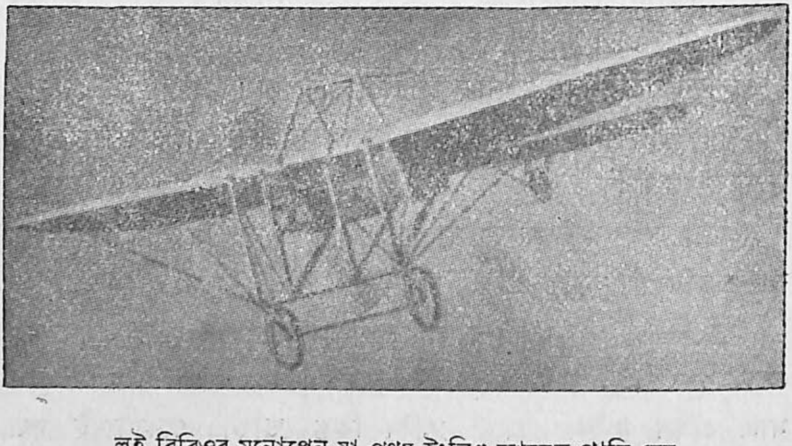
যাচ্ছিল না। হালকা মেঘ ও কুয়াশায় আকাশ থম্‌থম্‌ করছিল।

"ডোভার কোন্ দিকে?" ব্লিরিও প্রশ্ন করলেন।

আকাশের এক কোণে ধূসর একটু মেঘের দিকে আঙ্গুল দেখিয়ে ব্লিরিওকে ডোভারের সম্ভাব্য অবস্থান বলে দিলেন এরোড্রোম কর্তৃপক্ষ।

প্লেনে কম্পাস নেই, বেতারযন্ত্র নেই, দিগ্‌দর্শনের কিচ্ছু নেই। প্লেনে বেতারযন্ত্রের কথা তখন কেউ কল্পনাই করতে পারতো না।

ব্লিরিওর এরোপ্লেনের ইঞ্জিন চালু হল। হাতের ঝাঁকুনি দিয়ে কাঠের প্রপেলার ঘুরিয়ে তখন প্লেনের একটি মাত্র ইঞ্জিন স্টার্ট করতে হোতো। হাণ্ডেল মেরে মোটর গাড়ির ইঞ্জিন স্টার্ট করার মত আর কি। এই সেদিনও এরোপ্লেনের এলেম ছিল এইরকম। ভাবতে পারা যায় আজকাল এই সব কথা? গরগর ঘরঘর করে ইঞ্জিন



লুই ব্লিরিওর মনোপ্লেন যা প্রথম ইংলিশ চ্যানেল পাড়ি দেয়

চলছে। ঝরঝর করছে কাঠের ফ্রেমে ক্যানভাস লাগানো প্লেনের নড়বড়ে দেহখানা। সবে চলতে শিখেছে এইরকম ছোট্ট ছেলের মত টল্‌তে টল্‌তে ব্লিরিওর ছোট্ট প্লেনখানা মাটির ওপর দিয়ে গড়াতে লাগলো। তারপরই দৌড়। পঞ্চাশ ষাট গজ দৌড় লাগাবার পরই প্লেনখানা টাল খেয়ে কোনরকমে আকাশে ভেসে পড়লো। খোলা কক্‌পিট থেকে মুখ বার করে হাত নেড়ে ব্লিরিও মাটিতে অপেক্ষারত গ্রামবাসীদের বিদায় অভিবাদন জানালেন। আকাশপথে দুর্গম দুঃসাহসিক বাইশ মাইলের যাত্রা তাঁর শুরু হল। অনেকেই ভাবলেন এই গোঁয়ারতুমির পরিণাম আত্মাহুতি ছাড়া আর কিছু নয়। কেউ কেউ আবার রুমাল উড়িয়ে অভিনন্দন জানালেন ব্লিরিওকে। আবার কেউ নিভৃতে দু'ফোঁটা চোখের জলও ফেললেন। একজন মন্তব্য করলেন, যা অসম্ভব তাই সম্ভব করার জন্যই এইসব জিদ্দিবাজ বৈমানিকদের জন্ম। কোন মানা মানতে চান না এঁরা! ছোট্ট পাখির মত ব্লিরিওর প্লেনখানা আকাশে মিলিয়ে গেল। বায়নাকুলার দিয়ে দেখা গেল, একেবারে মিলিয়ে যায়নি তো। ছোট্ট একটি কালো বিন্দু মেঘলা আকাশে যেন আস্তে আস্তে অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে। ইংলিশ চ্যানেলে ধোঁয়া-ছাড়া জাহাজগুলো আবছা অস্পষ্ট দেখা যাচ্ছে কিন্তু ব্লিরিওর ছোট্ট মনোপ্লেনখানা একটু পরেই হারিয়ে গেল যেন।

মিনিট কুড়ির বেশী এই ধরনের ইঞ্জিন একটানা চালু থাকলে গরম হয়ে গিয়ে বিপদ ঘটাতো। ইঞ্জিনকে ঠাণ্ডা রাখার একমাত্র উপায় তখনকার দিনে ছিল বাতাস। ব্লিরিও জানতেন এই চ্যানেল পার

হতে গেলে তাঁর প্লেনের ইঞ্জিনকে কম্‌সে কম আধঘণ্টা অন্তত চালু রাখতেই হবে। ফেটে না গিয়ে ইঞ্জিন কি এতক্ষণ একটানা এই ধকল সহ্য করতে পারবে? বিপদ তো এইখানেই। কিন্তু বিপদের কোন ঝুঁকি না নিলে কি কেষ্ট মেলে?

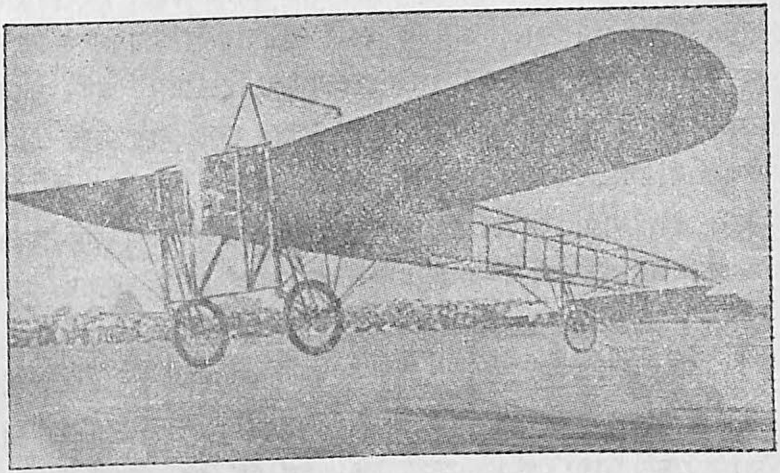
ক্যালে ছাড়ার পরই ব্লিরিও তাঁর প্লেনের ইঞ্জিনশক্তি কিছুটা কমিয়ে দিলেন। তাড়াহুড়ো বাড়াবাড়ি করলে স্বেচ্ছায় বিপদ ডেকে আনা হবে।

ঘর্‌র্‌ ঘর্‌র্‌ করে ইঞ্জিন চলছে। প্লেনখানা এগিয়ে চলেছে। একটু পরেই ব্লিরিওর বড় একা একা লাগতে লাগল। তারপরই আবার মনে হল, এই অনাস্বাদিত অভিজ্ঞতার তুলনা নেই। চুপচাপ বসে থাকা ছাড়া আর কি করার আছে? নীচে সমুদ্রের দিকে তাকিয়ে তিনি এগিয়ে চলেছেন। ইঞ্জিন চলছে নিজের ছন্দে। প্রপেলার ঘুরছে নিজের আনন্দে।

মিনিট দশেক এমনি করেই কেটে গেল। লেথামের মত এবার আর টরপেডো বোট নেই। সামনে ডোভারের দিকে এগিয়ে চলেছে একখানা ডেস্‌ট্রয়ার জাহাজ, নাম তার এস্‌কোপেট। এই জাহাজের গতিপথই হল ব্লিরিওর দিগ্‌দর্শন। এরই পিছু নিয়েছেন তিনি। কিন্তু কতক্ষণ? একটু পরেই জাহাজটির ওপর দিয়ে উড়ে গেলো তাঁর প্লেনখানা। প্লেনখানা উড়ে চলেছে সমুদ্রের ২৫০ ফিট উঁচু দিয়ে ঘণ্টায় প্রায় ৪৫ মাইল। পাঁচশো ফিটের বেশী উঁচুতে উঠতে পারে না ব্লিরিওর প্লেনখানা! হাসি পায় আজকাল। বর্তমান জেট্ প্লেনে হামেশা আমরা আটলান্টিক পার হচ্ছি তিরিশ চল্লিশ হাজার ফিট উঁচু দিয়ে।

জাহাজখানাকে পিছনে ফেলে, ওই একই লাইনে উড়ে চললেন ব্লিরিও। কক্‌পিট্‌ থেকে বার বার পিছনে তাকাতে লাগলেন তিনি। ঠিক পথে চলেছেন তো? মেঘলা কুয়াশায় একটু পরেই আর কিচ্ছু দেখা গেল না। জাহাজখানা দৃষ্টির বাইরে চলে গেল। আরও দশ মিনিট কেটে গেল। চ্যানেলের এপার-ওপার কিছুই আর দেখা যাচ্ছে না। অন্ধের মত এগিয়ে চললেন তিনি।

মিনিট কুড়ি কেটে গেছে। ইঞ্জিন গরম হয়ে গিয়েছে। এই বুঝি কিছু একটা হয়ে যায় এবার। হলও তাই। ইঞ্জিন অত্যন্ত গরম হয়ে গিয়ে প্লেনখানাকে আর আকাশে ভাসিয়ে রাখতে পারছে না। আস্তে



ব্লিরিও যে প্লেনে প্রথম ইংলিশ চ্যানেল পাড়ি দিয়েছিলেন সেই ধাচে গড়া এই ধরনের মনোপ্লেন আজও আকাশে উড়ছে।

আস্তে সেটা যেন নীচের দিকে নামতে লাগলো। ব্লিরিও প্রমাদ গুণলেন। কিন্তু আশ্চর্য বরাত। হঠাৎ কোথা থেকে ঝোড়ো ঠাণ্ডা খানিকটা হাওয়া এসে ছোট্ট প্লেনখানাকে বেসামাল বিপর্যস্ত করে তুললো। ব্লিরিও দক্ষ বৈমানিক। প্লেনখানার টাল সামলে নিলেন। ধাতস্থ হয়ে দেখেন, ঠাণ্ডা হাওয়ায় ইঞ্জিন তাঁর অনেকটা স্বাভাবিক হয়ে গিয়েছে! প্লেনখানাকে তখন তিনি আবার একটু একটু করে ওপরের দিকে তুলতে লাগলেন। মেঘলা আকাশের মধ্যে ডোভারের তীর যেন দেখা যাচ্ছে মনে হল। কলম্বাসের মত উল্লসিত হয়ে উঠলেন ব্লিরিও। ডোভারের পিছনে নর্থফল প্রান্তর দেখতে পেলেন তিনি। সেখানে তাঁর এক বন্ধুর ফ্ল্যাগ দেখাবার কথা। হ্যাঁ, ঠিক বন্ধুর মতোই এই ভোরে তিনি উঁচু একটা জায়গায় দাঁড়িয়ে ফ্ল্যাগ নেড়ে যাচ্ছেন। ইংলিশ চ্যানেল পাড়ি দেওয়া হয়ে গিয়েছে। এখন কোন রকমে নামতে পারলে হয় মাটিতে। একবার চক্কর মেরে ছোট্ট একটু উন্মুক্ত জায়গায় কোনরকমে নেমে পড়লেন তিনি। ল্যাণ্ডিং মোটেই ভাল হল না। গোত্তা খেয়ে কোনরকমে নেমে পড়লো প্লেনখানা। জখম হল প্লেনখানা কিন্তু ব্লিরিও অক্ষতদেহে নেমে এলেন প্লেন থেকে।

ব্লিরিও বাজি জিতেছেন। দেখতে দেখতে এই খবর ছড়িয়ে পড়লো সারা ইংলণ্ডে। খবর চলে গেল ফ্রান্সে। সংবর্ধনার শেষ নেই। কাগজে কাগজে ছবি ছাপা হল। প্রবন্ধ লেখা হল ব্লিরিওর জীবনী দিয়ে। ব্লিরিও অভিভূত হয়ে গেলেন। সংবর্ধনা সভায় লেথাম এসে যোগ দিলেন। বেচারী লেথাম! পুরস্কারের আর আশা নেই তাঁর।

তবুও তাঁকে ইংলিশ চ্যানেল পাড়ি দিতেই হবে। দুদিন পরই আর একবার চ্যানেল পার হবার চেষ্টা করলেন তিনি। কিন্তু কী বরাত! প্রায় পার হয়ে এসেছিলেন। ডোভারের মাইল দুই আগে আবার তাঁর ইঞ্জিন গেল বিগড়ে। জলে পড়ে গেলেন তিনি। এ যাত্রায়ও অবশ্য তিনি প্রাণে বেঁচে গেলেন।

অবিস্মরণীয় এক এয়ার রেস

২৫শে জুলাই ১৯০৯ সালে ছুঃসাহসিক এক ফরাসী বৈমানিক লুই ব্লিরিও তাঁর ছোট্ট একখানা মনোপ্লেনে ইংলিশ চ্যানেল পাড়ি দিলেন। সারা ইউরোপে হৈ হৈ রৈ রৈ পড়ে গেল। ইংলিশ চ্যানেল তো মাত্র বাইশ মাইল পথ। তবুও সেইসময়ে সমুদ্রের ওপর দিয়ে এইভাবে এরোপ্লেনে চ্যানেল পাড়ি দেওয়া যেন কল্পনাতীত ছিল। হৈ চৈ তো তাই হবেই !

অসম্ভবও যখন সম্ভব হল তখন সাহস বেড়ে গেল বৈমানিকদের। আকাশবিহারে পাল্লা বাড়ানোর প্রতিযোগিতা যেন বেড়েই চললো এরপর থেকে।

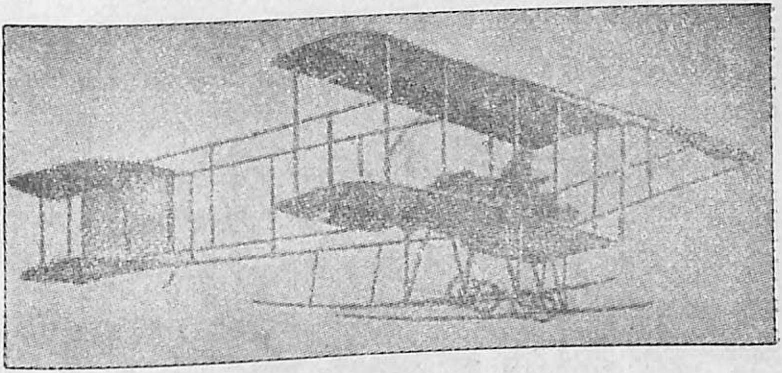
একটা পত্রিকার কর্তৃপক্ষ পুরস্কার ঘোষণা করে বসলো। কি না —লণ্ডন থেকে ম্যান্‌চেস্টার, প্রায় ১৮০ মাইল পথ, চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে যিনি এরোপ্লেনে প্রথম পাড়ি দিতে পারবেন, তাঁকে দশ হাজার পাউণ্ড পুরস্কার দেওয়া হবে। তখনকার দিনে দশ হাজার পাউণ্ড কম কথা নয়—এখনকার তুলনায় এর মূল্য ছিল অনেক বেশী। এতখানি পথ এরোপ্লেনে উড়ে যাওয়ার কথা কেউ ভাবতেই পারতো না তখন। অনেকে তাই বললো, এ পুরস্কার ঘোষণা একটা ভাওতা মাত্র। তামাসা করারই নামান্তর। ওই পত্রিকার প্রচার বাড়ানো

ছাড়া আর কিছু নয়। বাইশ মাইলের ইংলিশ চ্যানেল পাড়ি দিতেই বৈমানিকেরা সব বেদম হয়ে গিয়েছেন, আর এ হল প্রায় দুশো মাইল পথ। এও কি সম্ভব?

কিন্তু মানুষ পিছিয়ে তো কোনদিনও থাকে না। যত বিপদ তত উৎসাহ! হিমালয়ের মাউণ্ট এভারেস্টে মানুষ উঠলো কি করে? আরও উঁচু কোন পাহাড় পৃথিবীতে থাকলে তার ওপরও মানুষ একদিন না একদিন ঠিকই উঠতো।

পুরস্কার ঘোষণার পর বাঘা বাঘা বৈমানিক সব উঠে পড়ে লেগে গেলেন। সেকালের এই অসম্ভবকেই সম্ভব করে তুলতে হবে, এই হল তাঁদের জীবন পণ।

দুঃসাহসিক দুই বৈমানিক এই পুরস্কারের জন্য প্রতিযোগিতায়



১৯১০ সালে লণ্ডন-ম্যানচেস্টার এয়ার রেসে ইংরেজ বৈমানিক গ্রেহাম হোয়াইটের পঞ্চাশ অশ্বশক্তির ফারমান বাইপ্লেন।

নামলেন। একজন হলেন ইংরেজ, নাম গ্রেহাম হোয়াইট। অপরজন হলেন ফরাসী, নাম পলহাঁ, লুই পলহাঁ।

এ তো ঠিক দৌড়ানোর রেস নয় যে "রেডি, গেট্ সেট্" বলে বন্দুক ছুড়ে স্টার্ট দিতে হবে। চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে এই দীর্ঘ পথটুকু এরোপ্লেনে পাড়ি দিতে পারলেই বাজিমাত। এই অসাধ্য সাধন, আগে কে করতে পারে, তারই প্রতিযোগিতা।

তাড়াহুড়ো করে গ্রেহাম হোয়াইট একখানা পঞ্চাশ অশ্বশক্তির ফারমান বাইপ্লেন যোগাড় করে রওনা দিলেন লণ্ডনের উইলস্ডেন অঞ্চল থেকে। সেদিনটা ছিল ২৩শে এপ্রিল ১৯১০ সাল। তখন সবে ভোর হচ্ছে। অদম্য উৎসাহ, অসীম সাহস এবং ভগবান ভরসা করে হোয়াইট তো আকাশে উড়লেন। দর্শকদের মধ্যে কেউ দিলেন অন্তরের শুভেচ্ছা, কেউ জানালেন আন্তরিক অভিনন্দন। আবার আপনজন কেউ কেউ দুফোঁটা চোখের জলও ফেললেন এই আশঙ্কায় যে গ্রেহাম বোধহয় তাঁদের এই শেষ দেখা দিয়ে আকাশে উড়ে গেলেন।

দু' ঘণ্টার মধ্যে গ্রেহাম হোয়াইট্ লণ্ডন থেকে প্রায় ৮৫ মাইল দূর রাগ্‌বিতে পৌঁছে গেলেন। জনতার সে কী উল্লাস!

প্লেন তখন একটানা বেশীক্ষণ উড়তে পারতো না। ইঞ্জিন গরম হয়ে বিগড়ে যেতো। তাই দু' ঘণ্টা ফ্লাই করেই হোয়াইট রাগ্‌বিতে নেমে পড়লেন ইঞ্জিন ঠাণ্ডা করার জন্য।

ঘণ্টাখানেক বিশ্রাম নিয়েই গ্রেহাম আবার আকাশে উঠলেন। কিন্তু এবার তাঁর উৎসাহ এবং উদ্দীপনায় ভাঁটা পড়লো। টেক্-অফ্

করার কিছুক্ষণ পরই দেখেন প্রতিকূল আবহাওয়া। এলোমেলো ঝোড়ো বাতাসে প্লেনখানা তাঁর বেসামাল হয়ে পড়লো। হোয়াইট্ দক্ষ বৈমানিক। টাল সামলে ছোট্ট প্লেনখানাকে তিনি কোনরকমে আকাশে ভাসিয়ে রেখে এগিয়ে চল্‌লেন। কিন্তু বিধাতা বাদ সাধলেন। প্লেনের ইঞ্জিন গরম হয়ে গিয়ে, তাল-ছন্দ-লয় সব ভেঙ্গে দিয়ে কেমন যেন বেসুরো গাইতে লাগল প্রপেলারের শব্দ। হোয়াইট্ প্রমাদ গুণলেন। প্রায় একশো পনেরো মাইল পথ পাড়ি দেওয়া হয়ে গেছে তাঁর। এতখানি পথ অতিক্রম করে শেষে এইভাবে তাঁর তরী ডুববে? কিন্তু উপায় কি? প্লেনখানা ক্র্যাশ করলো বলে। গ্রেহাম আর ঝুঁকি নিতে পারলেন না। বাধ্য হয়ে তাঁকে লীচ্‌ফিল্ড সহরে (লণ্ডন থেকে ১১৭ মাইল দূরে) নেমে পড়তে হল।

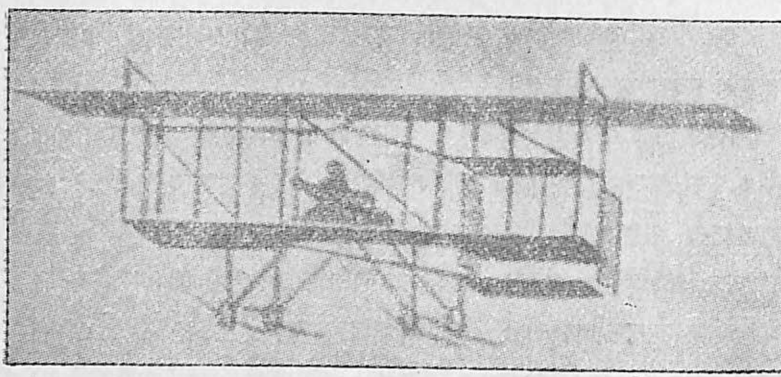
এরোপ্লেনের ইঞ্জিন ঠাণ্ডা করে নিয়ে গ্রেহাম আবার আকাশে উড়বেন ঠিক করলেন। আশা করলেন, আবহাওয়াও ততক্ষণে কিছুটা শান্ত হয়ে যাবে।

কিন্তু বিধি বাম। প্রতিকূল আবহাওয়া কিছুতেই অনুকূলে এলো না। বাতাসের বেগ বাড়তেই লাগল। ঝড়ে তখনকার দিনে প্লেন চালানো পাগলামি। বিকেল গড়িয়ে সন্ধ্যা হয়ে গেল। রাত বাড়তে লাগল। গভীর রাতেও বাতাসের বেগ আর আকাশের আর্তনাদ চলতে লাগল। সে আস্ফালন আর কমে না! গ্রেহাম সারা রাত ঘুমোতে পারলেন না।

দুর্যোগ রাতের অবসান হল। ভোর হবার আগেই গ্রেহাম তাঁর প্লেনখানার কাছে এসে দাঁড়ালেন। তখনকার দিনে (আজও)

ছোট্ট প্লেনগুলো যখন মাটিতে দাঁড়িয়ে থাকে তখন ভারি পাথরে দড়ি দিয়ে তার ডানা লেজ সব বেঁধে রাখা হয়। ঝোড়ো বাতাসে প্লেনখানা যাতে উলটি-পালটি খেয়ে জখম না হয়। গ্রেহাম দেখলেন, ছোট্ট প্লেনখানা তাঁর বাতাসের তাণ্ডব সহ্য করতে পারেনি। জখম হয়ে গেছে তাঁর প্লেনখানা। করুণ চোখে তাঁর জখমী প্লেনখানার দিকে তাকিয়ে রইলেন তিনি। ফাটা বরাত আর কাকে বলে? গ্রেহাম হোয়াইটের আর বাজি জেতা হল না। হোয়াইট্ তার জখমী প্লেন নিয়ে লণ্ডনে ফিরে এলেন।

ওদিকে ফরাসী বৈমানিক লুই পলহাঁ তাঁর এরোপ্লেন যোগাড় করতে দেরী করে ফেলেছেন। তিনি শুনেছেন, গ্রেহাম রওনা হয়ে গেছেন লণ্ডন থেকে। কিন্তু গন্তব্যস্থলে পৌঁছানর আগেই তাঁকে



১৯১০ সালে লণ্ডন-ম্যানচেস্টার এয়ার রেসে ফরাসী বৈমানিক লুই পলহাঁর ফারমান বাইপ্লেন।

লীচফিল্ডে নেমে পড়তে হয়েছে। প্লেনখানা তাঁর জখম হয়েছে। পলহাঁ পাগলের মত ছুটোছুটি করছেন তাঁর প্লেনের জন্য। চারদিন পরে, ২৭শে এপ্রিল তিনিও একখানা ফারমান বাইপ্লেনের ব্যবস্থা করলেন। তোড়জোড় করে, সারাদিন খেটেখুটে রওনা হতে তাঁর বিকেল হয়ে গেল। আর দেরী করা চলে না। কি জানি কখন গ্রেহাম লণ্ডনে ফিরে আবার যদি তাঁর যাত্রা সুরু করেন। বিপদের ঝুঁকি তো নিতেই হবে। সেদিনই বিকেল সাড়ে পাঁচটায়, অনেক বেলা থাকতে থাকতেই, পলহাঁ অনেকের শুভেচ্ছা এবং বিদায় সম্ভাষণ নিয়ে, টেক্ অফ্ করলেন লণ্ডন থেকে। ওই দিনই, দিনের আলোয়, যতটা পারেন এগিয়ে যাবেন তিনি, এই তাঁর সংকল্প। পারেন তো, একটানা লীচফিল্ড পর্যন্ত উড়ে যাবেন।

এদিকে লুই পলহাঁ রওনা হচ্ছেন শুনে গ্রেহাম হোয়াইটও আর স্থির থাকতে পারলেন না। ছট্ফট্ করতে লাগলেন তিনিও। তাঁর প্লেনখানা তাড়াহুড়ো করে সারিয়ে ফেলা হয়েছে। আর তিনি তো লণ্ডনেই। তোড়জোড় করে তিনিও সেদিনই রওনা হবার চেষ্টা করতে লাগলেন। কিন্তু সাড়ে ছ'টার আগে তাঁর রওনা হওয়া হয়ে উঠলো না। তার মানে, একঘণ্টার আগে পরে দুই বিখ্যাত বৈমানিক রওনা হয়ে গেলেন লণ্ডন থেকে ম্যানচেস্টার। দুজনেই জীবনপণ করে বাজি জেতবার জন্য জিদ্ ধরলেন।

সুরু হয়ে গেল রীতিমত এক এয়ার রেস যাকে বলে। মুখে মুখে সারা দেশে ছড়িয়ে পড়লো এই এয়ার রেসের কথা। পথে পথে হাজার হাজার লোক হাঁ করে দাঁড়িয়ে, আকাশপথে তাকিয়ে রইল।

কেউ হোয়াইটের পক্ষে, কেউ পলহাঁর। পথে দাঁড়িয়ে চিৎকার করতে লাগলো অসংখ্য মানুষ! কেউ কেউ আবার এই তামাসা দেখার জন্য ভিড় বাড়ালো।

টেক্ অফ্ করার পরই পলহাঁ দেখলেন বাতাস তাঁর অনুকূলে নেই! এলোমেলো বাতাস এরোপ্লেনখানাকে নিয়ে দাপাদাপি সুরু করে দিল। টাল সামলাতে সামলাতে পলহাঁ অতি হুশিয়ারের মত এগিয়ে চললেন। ছোট্ট প্লেনখানা তাঁর দোলনার মত দুলতে লাগলো। বাতাসের দাপট সামলাবার জন্য কখনো তাঁকে ওপরে তুলে নিতে হয় তাঁর ছোট্ট প্লেনখানাকে, আবার কখনও সেটাকে নীচে নামিয়ে নিতে হয়। ঝোড়ো কনকনে ঠাণ্ডা হাওয়ায় প্লেন-খানাকে সামলাতে গিয়ে পলহাঁ একেবারে নাজেহাল হয়ে পড়লেন। কিন্তু দমবার পাত্র নন তিনি। বড় শক্ত মন দিয়ে গড়া দক্ষ এই বৈমানিক।

উদ্‌ভ্রান্তের মত এগিয়ে চলেছেন তিনি। তখনকার কালে প্লেনে না ছিল বেতারযন্ত্র না ছিল কোন দিগদর্শনযন্ত্র। হঠাৎ পলহাঁ দেখলেন নীচে রেললাইন। ম্যাপে দেখেছেন, পথে রেললাইনই পাবার কথা। এই লাইন ধরে এগিয়ে চল্‌লেন তিনি। সবসময় ভাল নজরে পড়ে না এই লাইন কিন্তু পলহাঁর বরাত ভাল। হঠাৎ সামনে দেখেন একখানা ট্রেন চলেছে লাইন ধরে। ওই ট্রেনখানাকেই নজরে রেখে পলহাঁ এবার এগিয়ে চললেন। কিন্তু কতক্ষণ এইভাবে চলবেন? সন্ধ্যা হয়ে এলো। অন্ধকার ঘনিয়ে আসছে। ভালভাবে নজর পড়ে না কিছু।

বিপদের ওপর বিপদ। এই প্রায়-অন্ধকারে আবার বৃষ্টি নামলো! এলোমেলো বাতাসের সঙ্গে বৃষ্টি নামিয়ে ভগবান যেন পলহাঁকে পরীক্ষা করতে লাগলেন। পলহাঁর মনে হল মৃত্যু যেন হাতছানি দিয়ে তাঁকে ডাকছে। ভগবানের নাম স্মরণ করলেন পলহাঁ।

হঠাৎ দূরে যেন আলো দেখা যাচ্ছে! পলহাঁ ভাবলেন ওগুলো তো লীচফিল্ডের আলোকমালা। এইবার কোন একটা খোলা মাঠে কোন রকমে নেমে পড়তে পারলে বাঁচেন তিনি। কিন্তু নামবো বললেই তো আর প্লেনসুদ্ধ আকাশ থেকে ঝুপ্ করে নেমে পড়া যায় না। পলহাঁ তাঁর প্লেনখানাকে যতটা পারলেন নিরাপদে নীচের দিকে নামিয়ে আনলেন। খুব লো-ফ্লাইং করতে লাগলেন তিনি। নীচে একটা ফ্যাক্টরী মত দেখা যাচ্ছে। তারই পিছনে খোলা একটা মাঠ। ওখানেই নামবার চেষ্টা করতে হবে তাঁকে। প্লেনের মুখ ঘুরিয়ে মাঠের দিকটায় এগিয়ে গেলেন তিনি। ও মা! ঝপ্ করে প্লেনের ইঞ্জিন গেল বন্ধ হয়ে! পলহাঁ দেখলেন, পেট্রোল ট্যাঙ্কে এক ফোঁটাও পেট্রোল নেই! এখন উপায়? গ্লাইড করা ছাড়া নান্য পন্থা। কিন্তু টেলিগ্রাফের তারগুলো বাদ সাধলো। গেল বুঝি প্লেনখানা তারে জড়িয়ে। প্লেনের মুখ ঘুরিয়ে সাঁ করে কোন রকমে তিনি নিশ্চিত মৃত্যুর হাত এড়িয়ে মাটিতে নেমে পড়লেন। ঘাম দিয়ে যেন তাঁর জ্বর ছাড়লো! নিজেই বিশ্বাস করতে পারলেন না যে তিনি লীচফিল্ডে নিরাপদে নেমে পড়েছেন।

পলহাঁর প্লেনে যখন পেট্রোল ভরা হতে লাগলো তখন গ্রেহাম

হোয়াইট কোথায়? অন্ধকার হয়ে আসাতে প্রতিকূল আবহাওয়ায় হোয়াইটও ফোর্সড ল্যাণ্ডিং করতে বাধ্য হয়েছেন। লীচফিল্ডের প্রায় ষাট মাইল পথ পিছনে। পলহাঁ কোথায় হোয়াইট তা জানেন না। পলহাঁ কতদূর এগিয়েছেন, কোথায় নেমেছেন, না জানতে পেরে হোয়াইট ছট্‌ফট্‌ করতে লাগলেন। রাতে ঘুমোতে পারলেন না তিনি। ভোর হবার আগেই রাত থাকতে থাকতেই তিনি টেক্‌-অফ্‌ করলেন। কোথাও এতটুকু আলো নেই। রাত তখন আড়াইটে! অন্ধকারে অন্ধের মত আন্দাজে লীচফিল্ডের উদ্দেশে এগুতে লাগলেন তিনি। এদিক দিয়ে তিনি এক রেকর্ড করলেন। রাতে এর আগে, কেউ কখনও প্লেনে ফ্লাই করেননি।

যেমন করেই হোক্‌ এ রেস তাঁকে জিততেই হবে। জীবনপণ তাঁর। নীচে রেলের লাইন। সিগ্‌নালের দু'একটা আলো মিট্‌মিট্‌ করে জ্বলছে। অন্ধকারে এই সামান্য মিটমিটে আলোই হোয়াইটকে পথ দেখাতে লাগলো। কিছুটা এগুবার পরই তিনি দেখলেন সামনে লাইন ধরে একখানা মালগাড়ি এগিয়ে চলেছে। যতক্ষণ পারলেন, ততক্ষণই সেটাকে অনুসরণ করে চললেন। কিন্তু মালগাড়ির গতি খুবই কম—একটু পরেই মালগাড়িটা পিছনে পড়ে রইল। এতক্ষণে পুব আকাশে আলো দেখা দিয়েছে। নূতন উৎসাহে হোয়াইট প্লেনের গতি বাড়িয়ে দিলেন। কিন্তু দিনের আলো দেখা দিলে কি হবে, আবহাওয়া ক্রমেই প্রতিকূল হয়ে উঠলো। ভোরের বাতাস ঝোড়ো হাওয়ায় পরিণত হল। টাল খেতে খেতে ছোট্ট প্লেনখানা বেসামাল হয়ে পড়লো। হোয়াইট প্রমাদ গুণলেন। কত আর সামাল

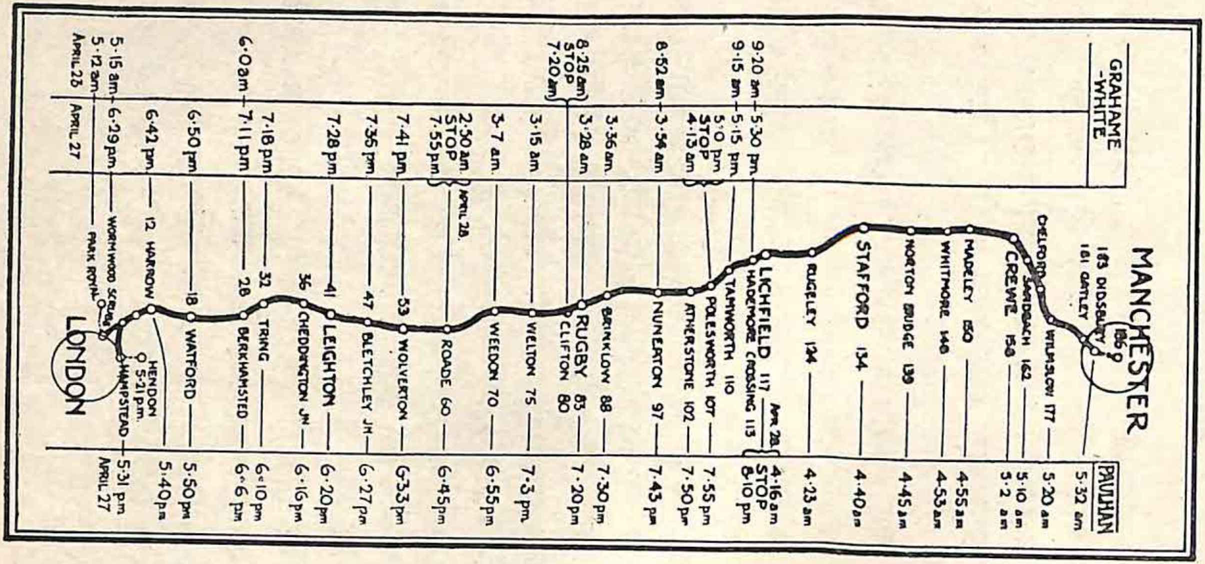
দেবেন তিনি। গ্রেহাম তাঁর সমস্ত শিক্ষা, কায়দা, দক্ষতা দিয়েও প্লেনখানাকে আয়ত্তে আনতে পারলেন না। এবারেও তাঁর বরাত খারাপ। গ্রেহামের আর লীচফিল্ড পৌঁছানো হল না। ঘণ্টা দুয়েক পথ চলার পরই বাধ্য হয়ে তাঁকে আবার মাটিতে নেমে পড়তে হল।

গ্রেহাম যখন মাটিতে নামতে বাধ্য হলেন, প্রায় সেই সময়ই ওদিকে লীচফিল্ড থেকে পলহাঁ টেক্-অফ্ করলেন ম্যান্চেস্টার অভিমুখে। এই না হলে এয়ার রেস? এমন রেষারেষির রেস কেউ কোনদিন কখন দেখেছে না শুনেছে?

লীচফিল্ড থেকে ম্যান্চেস্টার পৌঁছতে পলহাঁর আর কোন বেগ পেতে হল না। সকাল পাঁচটা বত্রিশ মিনিটে, ২৮শে এপ্রিল ১৯১০ সালে পলহাঁ বাজি মাত করলেন। বারো ঘণ্টা দু মিনিট সময় নিয়ে পলহাঁ লণ্ডন থেকে ম্যান্চেস্টার পাড়ি দিলেন। বাজি তিনিই জিতে নিলেন। মোট ফ্লাই করেছিলেন চার ঘণ্টা দু' মিনিট।

পলহাঁর সাফল্যে সারা ইউরোপে সে কী উল্লাস আর জয়ধ্বনি! বলা বাহুল্য, ইংলণ্ডের চেয়ে ফ্রান্সেই এই আনন্দোৎসব মুখর হয়ে উঠেছিল বেশী।

গ্রেহাম হোয়াইট সবই শুনলেন। তাঁর মনে কোন খেদ ছিল না। পলহাঁর সাফল্যের খবর পেয়েই তিনি বলেছিলেন, "পলহাঁ পুরস্কার পেলেন, এ ঠিকই হয়েছে। পৃথিবী খুঁজলেও পলহাঁর মত দক্ষ বৈমানিক আর একটিও মিলবে না। বৈমানিক হিসাবে আমি তাঁর কাছে শিশু।"



১৯১০ সালে লণ্ডন-ম্যানচেস্টার এয়ার রেসে ইংরেজ বৈমানিক গ্রেহাম হোয়াইট ও ফরাসী বৈজ্ঞানিক লুই পলহাঁ কি ভাবে জীবনপণ করে লড়েছিলেন। জয়ী হয়েছিলেন পলহাঁ।

আমরা জানি, এটা বিনয়ের কথা। তবু, এতে তাঁর উদার মনের কিছুটা আভাস মেলে বৈকি।

দুই বৈমানিকের মধ্যে কেউ কম যান না। বিমান ইতিহাসে এঁদের নাম তাই ভোলবার নয়। সেই ১৯১০ সালে, বিমান বিজ্ঞানে যা অসম্ভব ভাবা হোতো, তাই এঁরা দুজনে প্রতিযোগিতা করে সম্ভব করে তুলেছিলেন।

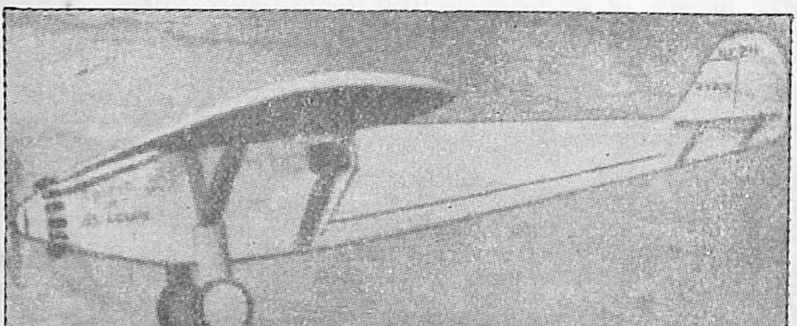
স্পিরিট অব সেণ্ট লুই

রাতটা এত দীর্ঘ মনে হচ্ছে কেন ?

উত্তেজনায় বিছানায় শুয়ে বিখ্যাত বৈমানিক চার্লস লিণ্ডবার্গ ছট্‌ফট্ করছেন। চোখে ঘুম নেই তাঁর।

রাত থাকতেই বিছানা ছেড়ে উঠে পড়লেন তিনি। ঘড়ি দেখলেন ভোর হতে আর বেশী দেরি নেই।

২০শে মে ১৯২৭ সাল। বিমান-ইতিহাসে এক স্মরণীয় দিন।



"স্পিরিট অব সেণ্ট লুই" যাতে চার্লস লিণ্ডবার্গ একা আটলাণ্টিক সমুদ্র পাড়ি দিয়েছিলেন।

রাত শেষ হয়ে দিনের আলোর পূর্বাভাস ফুটে উঠেছে পূব আকাশে। ভোর হল বলে।

আমেরিকার রুজভেল্ট্ ফিল্ড থেকে লিণ্ডবার্গের এক ইঞ্জিনওয়ালা ছোট্ট প্লেন "স্পিরিট অব্ সেন্ট্ লুই" আটলান্টিক সমুদ্র পাড়ি দেবার জন্য প্রস্তুত। ডানা-পাখা ইঞ্জিন সব চেক্ করা হয়ে গিয়েছে। বিশেষ ব্যবস্থা করে প্লেনে প্রয়োজন মতো পেট্রোলও পোরা হয়ে গিয়েছে।

সব ঠিকঠাক। লিণ্ডবার্গ টেক্ অফ্ করার জন্য প্রস্তুত।

কি মনে হল, লিণ্ডবার্গ হঠাৎ তাঁর মেকানিকদের প্রশ্ন করলেন, "একখানা ছোট্ট আরশি পাওয়া যায় না ?"

"আরশি" ? আশ্চর্য হয়ে পালটা প্রশ্ন করলেন প্লেনের ইঞ্জিনীয়ার।

"হ্যাঁ, আরশি। ছোট্ট একখানা আরশি পেলে মন্দ হোতো না।"

মেকানিকরা তো অবাক। প্লেনের ওজন কমানোর জন্য ক্যাপ্টেন লিণ্ডবার্গ সঙ্গে কিছু নেননি। না কাপড়-চোপড়, না খাবার-দাবার। বুক পকেটে একটা টুথ ব্রাশ। ব্যস্ আর কিছু না। বিশেষ ব্যবস্থা করে যতটা পারা গেছে পেট্রোল পোরা হয়েছে প্লেনে। এই দুস্তর অভিযানে কোথাও নেমে তো আর পেট্রোল নেওয়া চলবে না। তাই রসদ যা কিছু প্রয়োজন তা হল পেট্রোল। না খেলেও একদিন চলে যাবে কোন রকমে কিন্তু পেট্রোল ফুরলেই "স্পিরিট অব্ সেন্ট্ লুই" ঝুপ করে পড়ে যাবে আটলান্টিক সমুদ্রের অথৈ জলে।

আরশি নিয়ে কি সাহেব মুখ দেখবেন না চুল আঁচড়াবেন ?

লিণ্ডবার্গ বুঝিয়ে বললেন, "ছোট্ট একখানা আরশি কক্‌পিটে কায়দা করে ফিট্ করে নিলে খুব সুবিধা হোতো। চোখের সামনে আরশির মধ্যে দিয়ে কমপাসটা দেখা চলতো।"

আরশি এখন কোথায় পাওয়া যাবে ?

কারও মুখে কোনো কথা নেই।

পুব আকাশ রাঙা হয়ে উঠছে। দেরি করা আর চলে না।

দর্শকদের ভিড়ের মধ্যে থেকে গ্রাম্য একটি মেয়ে হঠাৎ এগিয়ে এলো। ভ্যানিটি ব্যাগ থেকে ছোট্ট একখানি আয়না বের করে সে প্রশ্ন করলো—"এটাতে কোন কাজ হতে পারে ?"

লিণ্ডবার্গ আয়নাখানা হাতে নিয়ে হেসে বললেন—"চমৎকার হবে। এইরকমটাই তো আমি চাইছিলাম। এটা আমি নিতে পারি ?"

লম্বা, ফর্সা, অতি সুপুরুষ এই পঁচিশ বছরের প্রাণবন্ত যুবকের সামনে লজ্জায় লাল হয়ে উঠলো মেয়েটির মুখ। ঘাড় নেড়ে শুধু সম্মতি জানালো সে। কোন উত্তর দিতে পারলো না।

লিণ্ডবার্গ মেয়েটির প্রত্যুৎপন্নমতিত্বের প্রশংসা না করে পারলেন না।

ধন্যবাদ জানিয়ে এই সামান্য দান গ্রহণ করলেন তিনি।

কয়েক মিনিটের মধ্যে কক্‌পিটের সামনে আরশিটিকে কায়দা মাফিক বসিয়ে দিলেন মেকানিকরা।

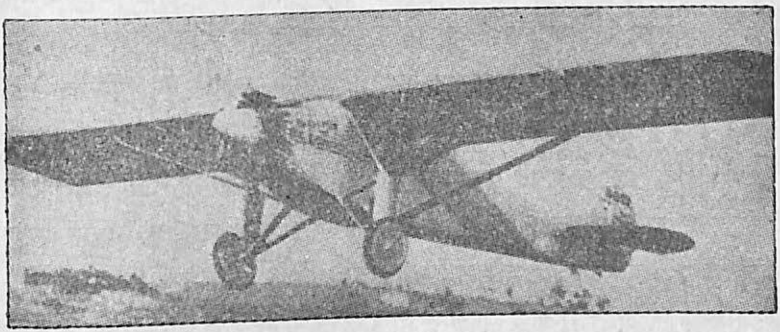
খুশী হয়ে লিণ্ডবার্গ প্লেনের কক্‌পিটে গিয়ে বসলেন।

প্লেনের ইঞ্জিন চালু হল। লিণ্ডবার্গ হাত নেড়ে বিদায় জানালেন সবাইকে। ভিড়ের মধ্যে সেই মেয়েটির দিকে তাকিয়ে লিণ্ডবার্গ দ্বিতীয়বার হাত নেড়ে বিদায় জানালেন।

রুমাল নেড়ে অভিবাদন না জানিয়ে মেয়েটি একই জায়গায় নিশ্চল হয়ে দাঁড়িয়ে রুমালে চোখ মুছতে লাগলো।

লিণ্ডবার্গের গুণগ্রাহী এই মেয়েটি কোন্ দূর গ্রাম থেকে এই ভোর রাতে এসেছে "স্পিরিট অব্ সেণ্ট লুই"-কে শুভেচ্ছা দিয়ে বিদায় জানাতে।

সাতটা বাহান্ন। লিণ্ডবার্গ তাঁর প্লেনখানাকে রানওয়ের ওপর দিয়ে দৌড় করালেন। পেট্রোলের ভারে প্লেনখানা বেসামাল। কোন রকমে তো সেটা মাটি ছেড়ে আকাশে উড়লো। রানওয়ের শেষ প্রান্তে বেড়ার গায়ে প্লেনখানা এই-লাগে এই-লাগে অবস্থা! দর্শকদের মধ্যে



আমেরিকার রুজভেল্ট ফিল্ড এরোড্রোম থেকে "স্পিরিট অব সেণ্ট লুই" টেক-অফ করার পরই।

আর্তনাদ শোনা গেল। গেল বুঝি প্লেনখানা ভেঙ্গে চুরমার হয়ে। না, প্লেনখানা কোন রকমে বেড়া টপ্‌কে গিয়েছে! স্বস্তির নিঃশ্বাস পড়লো সবাইকার। কিন্তু প্লেনখানা ওপরে উঠতে পারছে না কেন? পেট্রোলের ভারে কেমন যেন টাল-বেটাল হয়ে গিয়েছে। এরোড্রোমের এলাকা ছাড়িয়ে যেসব গাছগুলো আছে তাদের মাথা ছুঁই ছুঁই করছে প্লেনখানা—এই রকম বেসামাল অবস্থা তার। লিণ্ডবার্গের প্রিয় বন্ধু-বান্ধবরা তো ভয়ে সিঁটিয়ে গেলেন আবার এই বুঝি শেষ হয়ে গেলেন লিণ্ডবার্গ। কিন্তু না, এবারও টাল সামলে "স্পিরিট অব্ সেন্ট্ লুই" গাছগুলোর মাথার ওপর দিয়ে নিরাপদে শেষ পর্যন্ত আকাশে উড়ে চল্‌লো।

রুমাল নেড়ে বিদায় জানালেন লিণ্ডবার্গের গুণগ্রাহীরা। নিভৃতে ছু'একজন আবার নীরবে চোখের জলও ফেল্‌লেন। তাঁদের মনে হল, এই দুঃসাহসিক অভিযানে এঁরা বোধহয় লিণ্ডবার্গকে এই শেষবারের মত দেখলেন। আটলান্টিক সমুদ্রে কোথায় যে তাঁর সলিল সমাধি হবে, কে জানে! মাসখানেক আগেই ছু'জন ফরাসী বৈমানিকের তো তাই হল। চার্লস শন্‌গেসার আর ফ্রান্সিস কোলি। এঁদের প্লেনখানা টেক্ অফ্ করার পরই কুয়াসার আড়ালে সেই যে মিলিয়ে গেল আর তাঁদের কোন পাত্তাই পাওয়া গেল না! মহাসমুদ্রের অথৈ জলে কোথায় যে তাঁদের সলিল সমাধি হল কেউ জানতেও পারলো না। হারিয়ে গেলেন তাঁরা চিরদিনের মতো।

ভিড়ের মধ্যে সেই গ্রাম্য মেয়েটি ঝাপসা চোখে আকাশ পানে তাকিয়েই রইলো। কিছুই নজরে এলো না তার।

শোঁ-শোঁ করে "স্পিরিট অব্ সেণ্ট্ লুই" উড়ে চলেছে। কোথাও মেঘ, কোথাও কুয়াসা, কোথাও বা আবার এক পসলা বৃষ্টি হয়ে গেল। লিণ্ডবার্গ এগিয়ে চলেছেন নিউ ফাউণ্ডল্যাণ্ডের দিকে। ছেঁড়া ছেঁড়া মেঘ খেলা করছে তাঁর ছোট্ট প্লেনখানার সঙ্গে। লিণ্ডবার্গ মহাস্ফূর্তিতে তাঁর প্রিয় প্লেনখানাকে চালিয়ে নিয়ে চলেছেন। নিচে নিউ ফাউণ্ডল্যাণ্ড দেখা যাচ্ছে। একটু পরেই মাটির অস্পষ্ট রেখা অস্পষ্টতর হয়ে দিগন্তে মিলিয়ে গেল।

এবার জল, শুধু জল। লিণ্ডবার্গ এগিয়ে চলেছেন পুবে। "অরটিগ্" পুরস্কার পাবার জন্য তাঁকে একটানা উড়ে গিয়ে প্যারিসে পৌঁছতে হবে। প্রায় সাড়ে তিন হাজার মাইল পথ! সাত বছর আগের ঘোষিত এই পুরস্কার এ পর্যন্ত কেউ পায়নি। মাস আষ্টেক আগে রেনি ফন্‌ক প্রথম চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু পেট্রোলের ভারে বেসামাল প্লেনখানা তাঁর ক্র্যাশ করে। রেনি ফন্‌ক এই ক্র্যাশে আগুনে পুড়ে মারা যান। এরপর ফরাসী দুই বৈমানিক শন্‌গেসার আর কোলি কোথায় যে অদৃশ্য হয়ে নিখোঁজ হয়ে গেলেন কেউ তাঁদের হদিস্‌ই পেলো না।

লিণ্ডবার্গ এই সবই ভাবছিলেন।

সমুদ্রের জলের সঙ্গে সূর্যের আলো খেলা করে চলেছে নানা ঢংয়ে, নানা ভঙ্গিমায়। অপরূপ এই দৃশ্য দেখে লিণ্ডবার্গ মুগ্ধ হয়ে গেলেন। লিণ্ডবার্গ তন্ময় হয়ে এই অপূর্ব দৃশ্য দেখতে লাগলেন। ভাবলেন, ধন্য জীবন তাঁর, সার্থক জনম তাঁর। তাঁর প্রিয় ছোট্ট প্লেনখানা "স্পিরিট অব সেণ্ট লুই"-কে নতুন ক'র ভাল লাগলো তাঁর মানসপ্রিয়াকে

যেমন লাগে বধূ্ বেশে।

"স্পিরিট অব্ সেন্ট্ লুই" ঠিকমত এগিয়ে চলেছে। লিণ্ডবার্গ এরই সঙ্গে আলাপ স্থরু করে দিলেন। কত প্রাণের কথা, কত মনের ভাব! আলাপে বাদ সাধলো একটি মাছি।

গালের ওপর থেকে মাছিটাকে উড়িয়ে দিয়ে লিণ্ডবার্গ বল্লেন—"তুমি আবার কোথা থেকে এলে; অ্যাঁ?"

—"ও বুঝেছি। টেক্ অফ্ করার সময় কক্পিঠে ঢুকে পড়েছিলে। আর বেরুতে পারোনি বুঝি?"

—"তা বেশ হয়েছে। সঙ্গী একটা পেয়ে গেলাম আমি। পথ চলায় সঙ্গী থাকা ভাল। শাস্ত্রে বলে, একা পথ চল্তে নেই।"

লিণ্ডবার্গ আপন মনেই বক্ বক্ করে চলেছেন।

ছোট্ট আরশিটির মধ্যে দিয়ে কম্পাসটি তিনি মাঝে মাঝে দেখে নিচ্ছেন। গ্রাম্য মেয়েটির মুখটি মনে পড়ছে তাঁর। লিণ্ডবার্গ আপন মনে বলে চলেছেন—"সলজ্জ সেই মুখটির মধ্যে কি রকম একটা মায়া ছিল যেন। তাই না?"

"তাড়াহুড়োতে মেয়েটির নাম-ধাম কিছুই জিজ্ঞেস করা হল না।"

"ওই আরশিটাতে মেয়েটি কতবারই না তার নিজের মুখ দেখেছে। এখন একবারটি দেখা যায় না তার সেই মুখখানি?" কিন্তু না, আরশিটার মধ্যে কমপাসটা ছাড়া আর কিছুই দেখা যাচ্ছে না।

"এ আমি কি ভাবছি? আরশিটার মধ্যে মেয়েটির মুখ দেখা

যাবে কি করেই বা ?" লিণ্ডবার্গ তখন চোখ বন্ধ করলেন। চোখ বুজে মেয়েটিকে দেখবার চেষ্টা করলেন।

হ্যাঁ, মেয়েটির মুখটি চোখের সামনে যেন ভাসতে লাগলো। চোখ খুলে দেখেন, ও মা ! সামনে যে কুয়াসার অরণ্য !

প্লেনখানা গাঢ় কুয়াসার মধ্যে ঢুকে গেল। নজর পড়ে না কিছু। একেবারে যেন অন্ধ হয়ে গেলেন তিনি।

সঙ্গে দিক নির্দেশক যন্ত্র নেই, বেতার যন্ত্রও নেই। কি করেন এখন ? কুয়াসা এড়াতে গিয়ে যদি নিচের দিকে নামবার চেষ্টা করেন, তাহলে হয়তো জলে পড়ে যাবেন তিনি। তার চেয়ে বরং ওপরের দিকে ওঠবারই চেষ্টা করা যাক্। হাজার ফিট্ উঁচু দিয়ে উড়ছিলেন তিনি। আস্তে আস্তে প্লেনখানাকে তিনি উপরের দিকে তুলতে লাগলেন। লিণ্ডবার্গ "স্পিরিট অব্ সেণ্ট লুই"কে নিয়ে দু'হাজার, তিন হাজার, চার হাজার ফিট্ ওপরে উঠে গেলেন।

কিন্তু সেখানেও ওই ঘন কুয়াসা। আরো উপরে উঠতে লাগলেন তিনি। পাঁচ, ছয়, সাত, আট হাজার ফিট্। তবুও কুয়াসার সমুদ্র থেকে রেহাই পেলেন না। এই কুয়াসার ওপর আর এক বিপত্তি দেখা দিল।

ওই অত উঁচুতে খোলা কক্‌পিটে ঠাণ্ডায় জমে যাবার অবস্থা হল তাঁর। হাত-পা অবশ হয়ে এলো।

বিপত্তির ওপর আরও এক বিপদ দেখা দিল। সাধে কি বলে বিপদ একা আসে না। প্লেনের ডানার ওপর বরফ জমতে সুরু করেছে।

প্লেনখানাকে নিচের দিকে নামাতে বাধ্য হলেন লিণ্ডবার্গ। কুয়াসার মধ্যে অন্ধের মত এইভাবে "স্পিরিট্ অব্ সেন্ট্ লুই" এগিয়ে চলেছে লিণ্ডবার্গের নির্দেশ মতো।

এক টানা দশ ঘন্টা এই কুয়াসার সঙ্গে যুদ্ধ করা সাঙ্গ হল।

নরককুণ্ড থেকে পরিষ্কার আকাশে বেরিয়ে এলেন লিণ্ডবার্গ। হাঁফ ছেড়ে বাঁচলেন তিনি। হিসেব করে দেখলেন, এই এত কাণ্ড করতে গিয়ে প্রায় হাজার মাইল পথ অতিক্রম করা হয়ে গেছে তাঁর।

"সাবাস!" বলে বাহবা দিলেন লিণ্ডবার্গ তাঁর "স্পিরিট অব সেন্ট লুই"-কে।

ছোট্ট প্লেনখানা দিব্যি উড়ে চলেছে অথৈ জলের হাজার ফিট্ ওপর দিয়ে। ঝলমলে রোদে "স্পিরিট অব্ সেন্ট্ লুই" যেন হাসছে। কক্‌পিটের ছোট্ট জায়গায় একটানা একভাবে বসে থেকে থেকে লিণ্ডবার্গের হাতে পায়ে খিল ধরে যাবার অবস্থা। বসে বসেই যতটা পারলেন হাত-পা নাড়া-চাড়া করতে লাগলেন তিনি। একা এমনিভাবে একটানা উড়ে যেতে তাঁর একঘেয়েমি এসে গেল। অতীতের যত কিছু ঘটনা তাঁর মনে পড়তে লাগলো। কত তিক্ত সব অভিজ্ঞতা। কত মধুর সব স্মৃতি!

ভোর রাতে যাত্রা করতে হবে এই উত্তেজনায় আগের রাতে ঘুমোতে পারেননি তিনি। বড় ক্লান্ত মনে হচ্ছে তাঁর।

"মাছিটা গেল কোথায়? ওটার তো কই আর দেখা পাচ্ছি না! ওটার সঙ্গে কিছুটা আলাপ-টালাপ করতে পারলে সময় কাটতো

ভাল। কোথায় লুকিয়ে বসে আছে কে জানে! ভাষা বোঝে না, ডাকলে সাড়া দেবে না।"

মেয়েটির কথা আবার মনে পড়ে গেল লিণ্ডবার্গের। "কী সুন্দর ভঙ্গীতে ঘাড় নেড়ে সম্মতি জানালো আরশিটা দেবার আগে। প্রগলভ্ মেয়ের চেয়ে স্বল্পভাষী মেয়ে অনেক ভাল। বেশ মেয়েটি। সপ্রতিভ কিন্তু স্বল্পভাষী।"

লিণ্ডবার্গ সামনের ছোট্ট আয়নাটার দিকে তন্ময় হয়ে তাকিয়ে রইলেন। অতীত ও ভবিষ্যতের কথাই চিন্তা করছিলেন তিনি।

কখন যে ঢুলুনি এসে গেছে বুঝতেও পারেননি।

ঘুমিয়েই পড়েছিলেন নাকি?

হঠাৎ চোখের ওপর সূর্যের আলো পড়তে চমকে উঠে চেয়ে দেখেন, প্লেনখানা তাঁর বেসামাল হয়ে চক্কর খেতে খেতে সমুদ্রের জলের দিকে নেমে যাচ্ছে! ধড়মড়িয়ে উঠে তিনি "স্পিরিট অব্ সেণ্ট্ লুই"-কে আবার নিজের আয়ত্তে এনে ফেললেন। নিজেকে ধিক্কার দিয়ে তিনি ভাবতে লাগলেন, "হয়েছিল আর কি! কী মরণ ঘুমই না পেয়ে বসেছিল তাঁকে।"

কক্‌পিটের সামনে সাঁটা আয়নাখানার দিকে তাকিয়ে দেখেন, আশ্চর্য! সূর্যের আলো ঐ আয়নাখানা থেকেই ঠিকরে এসে ঠিক তাঁর চোখের ওপর পড়ছিল। এই ঘুম ভাঙ্গানো বিরক্তিকর আলো তাহলে ওই আরশিটা থেকেই ঠিকরে আসছিল? আর এই বিরক্তিই তাকে ঘুম থেকে তুলে বাঁচিয়ে দিয়েছে?

নূতন করে সেই গ্রাম্য মেয়েটির মুখটি তাঁর বারে বারে মনে

পড়তে লাগলো। মনে মনে তাকে অসংখ্য ধন্যবাদ জানালেন তিনি। লিণ্ডবার্গ নড়ে-চড়ে ঠিকঠাক হয়ে সতর্ক সজাগ হয়ে বসলেন। আপন মনে প্রশ্নোত্তর করে নিজেকে পরীক্ষা করতে লাগলেন তিনি।

"আজকের তারিখটা মনে আছে তো ?"

"হ্যাঁ, ২০শে মে ১৯২৭ সাল।"

"অরটিগ্ পুরস্কার কবে ঘোষিত হয়েছিল ?"

"৩০শে মে ১৯১৯ সাল।"

"মূল্য ?"

"পাঁচ হাজার পাউণ্ড।"

"ঠিক আছে। ঘুম ছুটে গিয়েছে।"

"লোকে আমায় পাগল বলে !"

"বলবেই তো। তা না হলে এই এক ইঞ্জিনওয়ালা ছোট্ট প্লেনে আমি এই দীর্ঘ তিনহাজার ছশো মাইল পথ পাড়ি দেবার পণ করবো কেন ? পাগলই বলুক আর ছাগলই বলুক, প্যারিসে গিয়ে যখন নামবো আমি, তখন সারা পৃথিবীর লোককে তাক লাগিয়ে দেবো। অনেকে আবার আমায় "ফ্লাইং ফুল" বলে, জিদ্ একগুঁয়েমি আর বেপরোয়া স্বভাবের জন্য। আরে, এসব না থাকলে কি বড় কিছু করা যায় ? প্লেনে আটলান্টিক সমুদ্র পাড়ি দেওয়া কি চারটিখানি কথা ? কে "ফুল" আর কে "ওয়াইজ" দেখিয়ে দেবো এবার। বিপদের ঝুঁকি তো নিতেই হবে তা না হলে "কেষ্ট" মিলবে কি করে ? হয় সাফল্য নয় মৃত্যু ! মৃত্যুর বেশী আর কিছু তো নয় ?"

আটলান্টিক সমুদ্রের ওপর ভেসে চলেছে একখানা যাত্রীবাহী জাহাজ। জাহাজের ক্যাপ্টেন "স্পিরিট অব সেণ্ট লুই"-কে দেখতে পেয়েছেন। বেতারে এই খবর পাঠিয়ে দিলেন তিনি।

লোকে জানলো, মুখে মুখে খবর রটে গেল—লিণ্ডবার্গ এখনও আকাশে ভেসে আছেন। সলিল সমাধি তাঁর হয়নি তাহলে! দিকে দিকে এই বার্তা রটে গেল ক্রমে। সে কী চাঞ্চল্য! সবাই উদগ্রীব হয়ে রইল এর পরের খবর পাওয়ার আশায়।

সেদিন সন্ধ্যায় আবার খবর পাওয়া গেল, হ্যাঁ, "স্পিরিট অব সেণ্ট লুই"-কে আয়ারল্যাণ্ডের উপকূলে দেখা গিয়েছে। অধীর আগ্রহে সবাই লিণ্ডবার্গের খবর পাবার জন্য পাগল তখন। সন্ধ্যার অন্ধকারে লিণ্ডবার্গ ইংলণ্ডের উপকূল ছাড়িয়ে ফ্রান্সের ওপর দিয়ে উড়ে চলেছেন।

লিণ্ডবার্গকে অভ্যর্থনা জানাবার জন্য ফরাসী জনতা লে-বুর্গ-এরোড্রোমে সমবেত হতে সুরু করেছে। লোক সমাগমের বিরাম নেই। এরোড্রোম লোকে লোকারণ্য হয়ে গেল।

জনতার প্রশ্নের শেষ নেই।

"লিণ্ডবার্গ কি শেষ পর্যন্ত প্যারিসে আসছেন?"

"স্পিরিট অব সেণ্ট লুই" কি এই রাতের অন্ধকারে নিরাপদে নামতে পারবে?"

"লিণ্ডবার্গ কি শেষ রক্ষা করতে পারবেন?"

রাত দশটা। এরোড্রোম থেকে সার্চ লাইট দিয়ে ওপরে আকাশ তন্ন তন্ন করা খোঁজা হচ্ছে।

এরোড্রোম চিনে নিতে যাতে লিণ্ডবার্গের কোন অসুবিধা না হয়

তার জন্য আতশবাজি ছোড়া হচ্ছে।

কোথায় কি! অধীর আগ্রহে প্রতীক্ষারত জনতা চঞ্চল হয়ে উঠলো।

কোথায় সেই "স্পিরিট অব সেণ্ট লুই?"

আকাশে কি একটা ক্ষীণ শব্দ শোনা যাচ্ছে না?

হ্যাঁ, প্লেনেরই শব্দ। উৎসাহে আনন্দে জনতা যেন পাগল হয়ে গেল। অবাধ্য এই জনস্রোত রুখবে কে?

শত অনুরোধ উপরোধ সত্ত্বেও বাঁধভাঙ্গা বন্যার জলের মত এরোড্রোমের রানওয়ে লোকে লোকারণ্য হয়ে গেল। এই এত লোকের ভিড়ে প্লেন নামবে কি করে? এ যুক্তি জনতাকে বোঝাবে কে?

লিণ্ডবার্গ প্রমাদ গুণলেন। এরোড্রোমের ভিড়ের মধ্যে তিনি "স্পিরিট অব সেণ্ট লুই"-কে নামাবেন কি করে? রানওয়ের মধ্যেও জনতা ঢুকে পড়েছে। এরোড্রোমের ওপর তিনি চক্কর দিতে লাগলেন।

বেটন চার্জ করে পুলিস বহু চেষ্টা করে শেষ পর্যন্ত রানওয়ের কিছুটা জায়গা খালি করে দিল। লিণ্ডবার্গ অপূর্ব দক্ষতায় ঝুপ করে মাটিতে নামিয়ে দিলেন তাঁর প্লেনখানাকে। সার্চ লাইটের আলোয় তাঁর চোখ তখন ধাঁধিয়ে গিয়েছে।

উন্মত্ত জনতা লিণ্ডবার্গের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লো। অভ্যর্থনার আতিশয্যে লিণ্ডবার্গের জামা প্যাণ্ট সব ছিন্ন-ভিন্ন হয়ে গেল। কে কার কথা শোনে? এ সবে কারও খেয়াল আছে তখন? লিণ্ডবার্গকে নিয়ে লোফালুফি চলতে লাগলো।

একটানা তিন হাজার ছশো মাইল পথ উড়ে এসে রাত সাড়ে দশটায় লিণ্ডবার্গ মাটিতে নেমেছেন। এরপর পুরো সাড়ে পাঁচ ঘণ্টা ধরে তাঁর ওপর জনতার যে অভ্যর্থনার অত্যাচার চলতে লাগলো তার তুলনা নেই। দেহ মন তাঁর অবসাদে ভেঙে পড়েছে।

লিণ্ডবার্গ অরটিগ্ পুরস্কার এবং পাঁচ হাজার পাউণ্ডের উড্রো উইলসন শান্তি পুরস্কার পেলেন। বিভিন্ন দেশ থেকে অজস্র সম্মান আর সর্বোচ্চ উপাধিতে তাঁকে ভূষিত করা হল।

দেশ দেশান্তর থেকে জয়মাল্য নিয়ে লিণ্ডবার্গ আমেরিকায় ফিরে এলেন। স্বদেশবাসীরা তাঁকে বিপুল উৎসাহে অভ্যর্থনা জানালো। লিণ্ডবার্গ এই উপলক্ষে পঁয়ত্রিশ লক্ষের ওপর চিঠি পেয়েছিলেন।

যে মেয়েটি তাঁকে রুজভেল্ট ফিল্ডে তার ছোট্ট আয়নাটি উপহার দিয়েছিল তার চিঠি কোথায়? চিঠির পাহাড়ের মধ্যে, হয়তো কেন, নিশ্চয়ই আছে তার একটি চিঠিও। কিন্তু কোন্ চিঠিটা তার? আয়নার কথা কোন চিঠিতেই উল্লেখ নেই। লিণ্ডবার্গ তন্ন তন্ন করে চিঠির বাণ্ডিল খুঁজতে লাগলেন। কিন্তু না, কোন হদিশ মিললো না মেয়েটির! এত আনন্দ, এত অভিনন্দন, এত উপহারের মধ্যে লিণ্ডবার্গের কেবলই মনে হতে লাগলো, কি যেন তাঁর হারিয়ে গিয়েছে! পেয়েছেন তিনি অনেক, কিন্তু হারিয়েছেন যেন তারও চেয়ে বেশী।

এমনও হয় নাকি কখনও

১৯২৭ সালে ছোট্ট একখানা এক ইঞ্জিনওয়ালা এরোপ্লেন (যার নাম ছিল (Spirit of St. Lewis) বিখ্যাত বৈমানিক লিণ্ডবার্গ, জেনেশুনে, বিপদের সব ঝুঁকি নিয়ে, আটলান্টিক মহাসমুদ্র পাড়ি দিয়ে জগদ্‌বিখ্যাত হয়ে গিয়েছিলেন। এগারো বছর পরে, ১৯৩৮ সালে, আর এক বৈমানিক এমনি আর একখানা এক ইঞ্জিনওয়ালা প্লেনে, আটলান্টিক পাড়ি দিয়েছিলেন। কিন্তু তাঁর এ কীর্তি হয়েছিলো নিজের অজান্তে।

আশ্চর্য অদ্ভুত অবিশ্বাস্য সেই রোমাঞ্চকর দুঃসাহসিক কাহিনী।

১৯৩৮ সাল।

তখনকার দিনেও এই প্লেনখানা ছিল পুরোনো। ১৬৫ অশ্বশক্তির একটি মাত্র ইঞ্জিনওয়ালা Curtiss Robin Monoplane। এখন সে প্লেনটিকে না উড়িয়ে এরোপ্লেনের মিউজিয়ামে রেখে দেবার কথা। পুরোনো মোটর গাড়িকে যেমন Vintage গাড়ি বলা হয়, একেও তেমন vintage প্লেন বলা চলে।

আমেরিকায় পশ্চিম উপকূলের Los Angeles থেকে এই প্লেন-খানাকে একটানা উড়িয়ে পাইলট ডগলাস করিগান এসে নেমেছিলেন পূর্ব উপকূলে নিউ ইয়র্কের কাছে বেনেট ফীল্ড এরোড্রোমে! এটা

কম কৃতিত্বের কথা নয়।

আধটন পেট্রোল নিয়ে ছোট্ট এরোপ্লেনখানা আকাশে একটানা উড়ে থাকতে পারতো প্রায় তিরিশ ঘণ্টা। গতি ছিল প্রায় ঘণ্টায় একশো মাইল।

করিগান-এর ইচ্ছা ছিল, ফিরতি পথে আবার একটানা উড়ে পশ্চিম উপকূলের ক্যালিফোর্নিয়াতে নেমে তিনি একটা রেকর্ড সৃষ্টি করবেন। করিগানের আদর্শ ছিলেন লিণ্ডবার্গ। এগারো বছর আগে, ১৯২৭ সালে যে এক ইঞ্জিনওয়ালা প্লেনে লিণ্ডবার্গ আটলান্টিক মহা-সমুদ্র পাড়ি দিয়েছিলেন সেই প্লেনের খুঁটিনাটি অনেক কাজ মেকানিক হিসাবে এই করিগান করেছিলেন। তারপর থেকেই লিণ্ডবার্গ-এর মত ওইরকম চমকপ্রদ একটা কিছু করবার জন্য করিগান সবসময়ই ছট্‌ফট করতেন।

ছোট্ট এক ইঞ্জিনওয়ালা প্রাইভেট প্লেনে আটলান্টিক পার হবার অনুমতি তাঁর কিছুতেই মিলছিল না। বিশেষকরে জগদ্‌বিখ্যাত মহিলা বৈমানিক অ্যামেলিয়া ইয়ারহার্ট ১৯৩৭ সালে এমনি একটা দুঃসাহসিক অভিযানে নিখোঁজ হয়ে হারিয়ে যাবার পর তো আর এ ধরনের 'গোয়াতুর্মি'র প্রশ্নই ওঠে না। আটলান্টিক পার হবার ছাড়পত্র বারে বারে না-মঞ্জুর হওয়াতে করিগান নাকি অতিষ্ঠ হয়ে একদিন বলে ফেলেছিলেন—

"আরে ধুত্তোর সন্ধের ঝোঁকে ফ্লয়েড বেনেট ফীল্ড-এ নেমে পড়ে এরোড্রোমের বড়কর্তারা যখন বাড়িমুখো হবে, তখন প্লেনে পুরো পেট্রোল পুরে দাও না কেন পাড়ি তা হলেই তো কেল্লা ফতে।"

১৬ই জুলাই ১৯৩৮ সাল।

ঠিক এক সপ্তাহ আগে করিগান মনোপ্লেনে নিউ ইয়র্কের কাছে ফ্লয়েড বেনেট ফীল্ড-এ নেমেছেন।

আবহাওয়ার পূর্বাভাস ভাল।

করিগান ক্যালিফোর্নিয়াতে ফেরবার জন্য তৈরী। একটা রেকর্ড সৃষ্টি করবার জন্য উদ্‌গ্রীব তিনি। মাঝরাতে রওনা দিতে পারলেই সবদিক থেকে সুবিধা তাঁর। কিন্তু বাগ্‌ড়া দিলেন এরোড্রোম কর্তা। —"তা কি করে হবে? এমন বেআইনী কাজ আমি আপনাকে করতে দিতে পারি না। রাতের অন্ধকারে ওই অত পেট্রোল নিয়ে আপনার ওই এক ইঞ্জিনওয়ালা প্লেনে আমি আপনাকে কিছুতেই 'টেক অফ' করতে দিতে পারি না।"

করিগান আবেদন জানালেন—

—"কিন্তু সব ঝুঁকি আমি নিচ্ছি। আপনার কোন দায়িত্ব থাকবে না।"

—"না, তা হয় না। আপনাকে ভোর হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করতেই হবে।"

তিতোবিরক্ত হয়ে করিগান রাত কাটালেন হ্যাঙার-এর মধ্যে তাঁর ছোট্ট প্লেনখানার পাশে শুয়ে।

ভোর হবো হবো, এমনি সময় ধড়মড়িয়ে উঠে দেখেন সামনেই এরোড্রোম কর্তা!

"—তৈরী হয়ে নিন মিস্টার করিগান।" ভোরের আবছা আলোতেই আপনি টেক অফ করতে পারেন। করিগান কৃতজ্ঞস্বরে

বললেন—"অশেষ ধন্যবাদ। কোন রানওয়ে ?"

"—যেটা খুশী আপনার। কিন্তু এরোড্রোমের পশ্চিমদিকে কিছু কাজ হচ্ছে—ওদিকটা দিয়ে না ওড়াই ভাল।"

করিগান চটপট তৈরী হয়ে নিলেন।

বাতাস নেই বললেই চলে। থমথমে আবহাওয়া। লম্বা রান-ওয়েটার পশ্চিম থেকে পুবে টেক অফ করাই সাব্যস্ত করলেন করিগান।

করিগান-এর প্লেনখানা ছুট লাগালো পুরো ইঞ্জিন শক্তি নিয়ে রান-ওয়ের ওপর দিয়ে। দিগন্তে তখন ভোরের আলো, আশার আলো!

হাজার গজ ছুট লাগাবার পর কোন রকমে যেন মাটির মায়া কাটিয়ে আকাশে উঠলো প্লেনখানা। পুরো পেট্রোলের ভারে প্লেন-খানা কেমন যেন বেসামাল!

"আরও উঁচুতে উঠতে হবে কোনরকমে", করিগান মনে মনে ভাবলেন, 'তবেই প্লেনখানাকে ঠিকমতো নির্দিষ্ট পথে আয়ত্তে আনা যাবে।'

প্লেনখানাকে পুবমুখো চালিয়ে ধীরে ধীরে উপরে উঠতে লাগলেন তিনি। ভাবলেন, 'শ' পাঁচেক ফুট ওপরে উঠে তবেই তিনি প্লেন-খানার মুখ ঘোরাবেন পশ্চিমমুখো।"

অল্টিমিটার (উচ্চতা পরিমাপ যন্ত্র)-এ দেখলেন পাঁচশো ফুট নীচের মাটি কুয়াশায় ঢেকে গিয়েছে। কিছুই দেখতে পাচ্ছেন না তিনি। ধীরে ধীরে প্লেনখানার মুখ ডান দিকে ঘোরাতে লাগলেন। কতখানি ঘোরাবেন? কমপাস (দিগ্‌দর্শী) যন্ত্রের দিকে তাকালেন তিনি।

ওমা! ককপিটের কমপাসটা তো কাজ করছে না! কমপাসের

ভেতরের তরল পদার্থটুকু সব 'লিক' করে বেরিয়ে গিয়েছে! তা হলে এখন উপায় ?

দ্বিতীয় একটি কমপাস রয়েছে তার পায়ের কাছে। রওনা হবার আগে সেটাকে তিনি পশ্চিমমুখো যাবার জন্য set করে রেখেছিলেন। এই কমপাসটা দেখতে একটু অসুবিধা কিন্তু উপায় নেই। ডান দিকে মোড় নিয়ে এই কমপাসের সঙ্গে মিলিয়ে নিলেন তিনি তাঁর পথনির্দেশ। নিশ্চিন্ত হয়ে ক্রমেই আরও উঁচুতে উঠতে লাগলেন তিনি। মাটির দিকে তাকিয়ে দেখেন সব কিছু কুয়াশায় ঢাকা। কিচ্ছু নজরে আসে না।

একেবারে আনাড়ি যে ভুল মাঝে মাঝে করে থাকে, করিগান অজান্তে সেই ভুল করে বসলেন। কমপাসের রিডিং তিনি ভুল দেখলেন—মানে তিনি অজান্তে উড়ে চললেন বিপরীত দিকে—১৮০° তফাৎ হয়ে গেল তার কমপাসে দেখা দিগ্‌নির্ণয়! পশ্চিমের দিকে না গিয়ে তিনি উড়ে চললেন পুবে! সোজা আটলান্টিক মহাসমুদ্রের কোলে! করিগান জানতেও পারলেন না কি আশ্চর্য অবিশ্বাস্য অভিযানে তিনি এগিয়ে চললেন!

লণ্ড আইল্যাণ্ড-এর দু-চারজন করিগান-এর ছোট্ট প্লেনটিকে সোজা পুবমুখো যেতে দেখে কিছুটা হৈ-চৈ করেছিল। কেউ কেউ বলতে লাগলো—করিগান নিশ্চয়ই লস এনজেলস যাবার অছিলায় আটলান্টিক মহাসমুদ্র পাড়ি দিচ্ছেন। আটলান্টিক পাড়ি দেবার ছাড়পত্র তাঁকে আগের বছর দেওয়া হয়নি, এ নিশ্চয়ই তারই প্রতিক্রিয়া। কিন্তু এ অভিযান তো দুঃসাহসিক নয়, এ অভিযান আত্মঘাতী হবারই নামান্তর!

কিন্তু করিগান জেনে শুনে এই অভিযান সুরু করেননি নিশ্চয়ই। তাঁর প্লেনে কোন রেডিও ছিল না। আটলান্টিক মহাসমুদ্রের আবহাওয়ার পূর্বাভাস তাঁর কাছে কিছুই ছিল না। না ছিল এই মহাসমুদ্রের কোন ম্যাপ। খাবারের মধ্যে ছিল কিছু চকোলেট। পানীয় জল নেই, গরম স্যুট নেই, এমনকি পাসপোর্ট পর্যন্ত নেই তাঁর কাছে! এই অবস্থায় করিগান নিশ্চয়ই এই এক ইঞ্জিনওয়ালা প্লেনে আটলান্টিক পাড়ি দেবার দুঃসাহস করেননি। আরও একটা কথা। লস এনজেলস থেকে নিউ ইয়র্কের কাছে ফ্লয়েড বেনেট ফীল্ড-এ যখন নেমেছিলেন তিনি, তখন তাঁর প্লেনের পেট্রোল ট্যাঙ্কে সামান্য লিক দেখা গিয়েছিল। ট্যাঙ্ক খুলে ওয়েল্ড করিয়ে লিক সারাতে তাঁর আরও অনেক দেরি হয়ে যাবে এই ভেবে তিনি এই বিপদের ঝুঁকি নিয়েছিলেন যে, তেমন প্রয়োজন হলে ফোর্স ল্যাণ্ড করবেন তিনি ফিরতি পথে। করিগান ছিলেন পাকা মেকানিক, পাকা পাইলট তো বটেই। আটলান্টিক পাড়ি দেবারই যদি তাঁর মতলব ছিল তাহলে জেনে শুনে তিনি এমন মারাত্মক বিপদের ঝুঁকি কখনই নিতেন না, বলা বাহুল্য। সমুদ্রের ওপর তো আর ফোর্স ল্যাণ্ড করিয়ে পেট্রোল ট্যাঙ্কের লিক সারানো যায় না। এসব যুক্তি থেকে যথেষ্ট প্রমাণ থেকে গিয়েছে যে তিনি সত্যই অজান্তে ভুল করে আটলান্টিক মহাসমুদ্রের ওপর দিয়ে উড়ে চলেছিলেন।

মেঘরাজ্যের মধ্য দিয়ে মাটি দেখবার চেষ্টা করছিলেন করিগান। হঠাৎ দেখেন একটি শহর। যেটাকে তিনি বাল্টিমোর ভাবলেন সেটা হল আসলে কিন্তু বোস্টন।

পেট্রোলের ভার যত কমতে থাকলো প্লেনখানাকে তত উঁচুতে ওঠাতে লাগলেন তিনি। এতে প্লেনের গতি তিনি বাড়াতে পারবেন পাতলা বাতাসের মধ্যে দিয়ে। যত উঁচুতে ওঠা যায় বাতাস তত পাতলা হয়।

আট ঘণ্টা ওড়বার পর প্লেনখানা উড়ে চলেছিল চার হাজার ফিট ওপর দিয়ে। করিগান যখন মনে মনে আন্দাজ করলেন যে, তিনি আছেন কেনটাকি প্লেনসের ওপর, তখন আসলে তিনি উড়ে চলেছেন নিউ ইয়র্ক থেকে আটশো মাইল উত্তরপুবে নোভাস্কেসিয়া ওপর দিয়ে।

নীচের দিকে মেঘে-ঢাকা আকাশ ছাড়া কিছুই নজরে আসে না। ঘন মেঘের ওপর দিয়ে উড়ে চলেছেন করিগান। বারো ঘণ্টা কেটে গেল। তিনি ভাবছেন প্লেনখানার অবস্থান এখন সম্ভবত মেম্ফিসের ওপর, কিন্তু তখন তিনি অজান্তে উড়ে চলেছেন আটলান্টিক মহাসমুদ্রের ওপর দিয়ে—নীচে মাটির নামগন্ধ নেই।

আরও ঘণ্টা দুই কেটে গেল। করিগান আন্দাজ করলেন তিনি আছেন লিটল রক আরকনেসাসের ওপর আসল তিনি কিন্তু উড়ে চলেছেন নিউ ফাউণ্ডল্যাণ্ড ছাড়িয়ে মহাসমুদ্রের ওপর দিয়ে!

এমনও হয় নাকি কখনও?

মহাকাশে ভাসতে ভাসতে করিগান উড়ে চলেছেন ঘণ্টার পর ঘণ্টা। দিগন্তের কোন চিহ্ন পর্যন্ত দেখা যায় না। নীচের পৃথিবীর কথা তো ওঠেই না।

রাতে প্রায় আট হাজার ফিট পর্যন্ত প্লেনখানাকে ওপরে তুলে নিয়েছিলেন করিগান। সকাল হতে দেখেন তিনি উড়ে চলেছেন

মেঘের রাজ্যে। মেঘের পাহাড় ওপরে উঠে গেছে প্রায় পনেরো হাজার ফিট। এই মেঘের পাহাড় ডিঙ্গিয়ে যাবার ক্ষমতা তাঁর ছোট্ট প্লেনটির নেই। অত উঁচুতে উঠতেও পারবে না সেটা। বাধ্য হয়ে তাঁকে মেঘের মধ্যে দিয়ে উড়ে যেতেই হবে। এই ঝড়-জলের মেঘের মধ্যে দিয়ে যাওয়া মানেই ছোট্ট প্লেনখানাকে নিয়ে উলটি-পালটি খাওয়া। কিন্তু উপায় নেই। এই ভাবে আরও ঘণ্টা দুই কাটল। বৃষ্টি কমলে করিগান দেখলেন, প্লেনের ডানায় বরফ জমতে আরম্ভ করেছে! এটাই তখনকার দিনে সবচেয়ে বিপদের কারণ ছিল। ডানায় বরফ জমা মানেই প্লেনটা বেশী ভারী হয়ে গিয়ে বেসামাল হয়ে যাবে। এর একমাত্র উপায় ছিল তখনকার দিনে—বরফ জমার সঙ্গে সঙ্গে সেগুলো ভেঙে দেওয়া। করিগান সঙ্গে একটা আট ফুট ডাণ্ডা নিয়ে ছিলেন। তাই দিয়েই তিনি খুচিয়ে খুচিয়ে বরফ ভেঙে দিতে লাগলেন ডানা থেকে।

করিগান এখনও জানেন না তিনি ভুল পথে আটলান্টিক মহা-সমুদ্রের ওপর দিয়ে উড়ে চলেছেন!

তাঁর ধারণা তিনি উড়ে চলেছেন এল পাস-এর উত্তরের পাহাড়ের ওপর দিয়ে। হঠাৎ মেঘ পরিষ্কার হয়ে গেল। নীচের দিকে তাকিয়ে করিগান-এর মাথা ঘুরে গেল।

—"এ কী! সমুদ্র কোথা থেকে এলো!"

চমকে উঠলেন তিনি। মুহূর্তের জন্য কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে গেলেন। কিন্তু সম্বিৎ ফিরে পেয়েও তিনি বুঝতে পারলেন না যে তিনি আটলান্টিক মহাসমুদ্রের ওপর দিয়ে উড়ে চলেছেন।

আবার ভুল করলেন তিনি।

তিনি ভাবলেন, তিনি পুব থেকে পশ্চিমে পাড়ি দিতে গিয়ে আমেরিকা মহাদেশ শেষ করে অজান্তে প্রশান্ত মহাসাগরের ওপর এসে পড়েছেন হয়তো। গতি বাড়ানো ছিল। বাতাসও বোধহয় অনুকূলে ছিল তাই এই অভাবনীয় কাণ্ড ঘটে গিয়েছে।

কিন্তু—। খটকা লাগলো মনে।

তিরিশ ঘণ্টার কমে আমেরিকা পাড়ি দেওয়া অসম্ভব, আর তিনি উড়ে এসেছেন ছাব্বিশ ঘণ্টা।

উল্টো মুখো ফিরবেন নাকি ভাবতে লাগলেন করিগান। কিন্তু তৃতীয় ভুল আর করলেন না তিনি। করিগান এগিয়ে চললেন।

হঠাৎ সব রহস্যের সমাধান হয়ে গেল তাঁর কাছে। করিগান ভাবলেন পায়ের কাছে যে কমপাসটা দেখে নিজের পথ-নির্দেশ নিয়েছিলাম সেটা ভুল দেখিনি তো? পশ্চিম মুখো উড়ে না গিয়ে পুবমুখো উড়ে আসিনি তো?"

কথাটা ভাবতেই সমস্ত শরীরটা তাঁর হিম হয়ে গেল যেন। কমপাসটার দিকে তাকাতেও কেমন যেন সাহস হল না তাঁর।

পরে কমপাসটা দেখেই তাঁর সন্দেহটাই সত্যে পরিণত হল। নিজের নির্বুদ্ধিতার ওপর ধিক্কার দেওয়া ছাড়া তখন আর কি করবেন তিনি?

এখন উপায়?

এগিয়ে যাওয়া ছাড়া ন অন্য পন্থা।

করিগান বেপরোয়া হয়ে সামনের দিকে এগিয়ে চললেন।

ভগবান ভরসা এখন।

কোন রকমে আয়ারল্যাণ্ড-এ যদি পৌঁছতে পারেন তবে বাঁচোয়া। সাতাশ ঘণ্টা একটানা উড়ে এসেছেন তিনি নির্ধারিত পথের উল্টো দিকে। আর বেশী পেট্রোল বোধহয় প্লেনে নেই যাতে তিনি বেশীক্ষণ আকাশে উড়ে থাকতে পারবেন। এমন লজ্জার কথা কাউকে বলার নয়। কিন্তু এই লজ্জাই শেষ পর্যন্ত করিগানকে জগদ্‌বিখ্যাত করে দিল।

করিগান উড়ে চলেছেন সমুদ্রের সামান্য ওপর দিয়ে। হঠাৎ তাঁর নজরে পড়লো দূর দিগন্তে সবুজ সীমারেখা। উল্লসিত হয়ে উঠলেন তিনি। কোন্ অজানা রাজ্যে এসে পড়লেন তিনি? কলমবাসেরও বোধহয় এমনি আনন্দ হয়েছিল আমেরিকার মাটি দেখে।

নূতন উদ্যমে করিগান এগিয়ে চললেন পৃথিবীর মাটির উদ্দেশে। মাটির স্পর্শ পাবার জন্য আকুল হয়ে উঠলেন তিনি। হঠাৎ নজরে পড়লো একটা এরোড্রোম, বড় বড় অক্ষরে লেখা বাল্ডানেল।

ডাবলিন-এর এরোড্রোম বাল্ডানেল?

হাতে স্বর্গ পেয়ে গেলেও তিনি এত আনন্দিত হতেন না। ক্লান্ত করিগান তার ছোট্ট প্লেনখানাকে অতি সন্তর্পণে টুক করে রানওয়ের ওপর নামিয়ে দিলেন।

প্লেনের পেট্রোল তখন প্রায় ফুরিয়ে এসেছে।

এরোড্রোম কর্তারা তাঁর কাছে আসতেই, করিগান প্লেন থেকে নেমে এসে বললেন—

“আমার নাম করিগান। ডগলাস করিগান। আমি নিউ ইয়র্ক

থেকে আসছি!"

—"হ্যাঁ, আমরা জানি।"

উত্তর শুনে করিগান অবাক হয়ে গেলেন।

—"আপনারা জানেন? সেকী? কি করে?

—"নিউ ইয়র্ক আমাদের আগে ভাগেই বেতারে সাবধান করে দিয়েছিল। আপনি তো টেক অফ করেই সোজা পূবমুখো উড়ে এসেছেন, আয়ারল্যাণ্ড-এর উদ্দেশে!"

তারপর করিগানকে নিয়ে সে কী হৈ চৈ!

জয়মাল্যে তিনি যেন ব্যতিব্যস্ত হয়ে পড়লেন! সবচেয়ে মুস্কিল হল যখনই করিগান বুঝিয়ে বলতে গেছেন তাঁর এই আশ্চর্য অদ্ভুত অভিযান কি করে সম্ভব হল, কেউই তা বিশ্বাস করে না।

তাদের সবাইকার ধারণা করিগান এই আটলাণ্টিক পাড়ি দিয়েছিলেন, আগে-ভাবেই সব কিছু প্ল্যান করে!

করিগান কিন্তু সবাইকে জানাতে চেয়েছেন তিনি আটলাণ্টিক মহাসমুদ্রে পাড়ি দিয়েছেন নিজের অজান্তে!

কিন্তু সবাই বলে—"এমনও হয় নাকি কখনও?"

অ্যামেলিয়া ইয়ারহার্ট

অ্যামেলিয়ার কথা মনে পড়লেই বড় কষ্ট হয়।

প্রশান্ত মহাসাগরের ওপর কোথায় যে তিনি হারিয়ে গেলেন, আজ পর্যন্ত তা কেউ জানে না। বেতারে পাঠানো তাঁর শেষ বার্তা হল—

"মাটির দেখা এখনও মেলেনি। পেট্রোল যা আছে তাতে বড় জোর মাত্র আধঘণ্টা ওড়া চলবে।"

বিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকেও এরোপ্লেনে ওড়ার ব্যাপারে মেয়েদেরও কম উৎসাহ ছিল না। অদম্য আগ্রহ এবং অসীম সাহস তাঁরাও কম দেখাননি। বিখ্যাত মেয়ে-বৈমানিকদের অন্যতম হলেন অ্যামেলিয়া ইয়ারহার্ট। মেয়েদের মধ্যে, ইনিই প্রথম আটলান্টিক পাড়ি দেন "ফ্রেণ্ডসিপ্" নামে একখানা এরোপ্লেনের যাত্রী হয়ে ১৯২৮ সালের 'মে' মাসে। পাড়ি দিতে এই প্লেনখানার সময় লেগেছিল কুড়ি ঘণ্টা চল্লিশ মিনিট।

"কেমন লাগলো ?" জিজ্ঞাসা করায় অ্যামেলিয়া বলেছিলেন,

"এই অভিযানে সমুদ্রের জল দেখা গিয়েছিল মাত্র ঘণ্টা দুয়েকের কিছু বেশী। ক্যানাস সহরের শস্য ক্ষেতের ওপর দিয়ে যাচ্ছি, না অন্য কোথাও দিয়ে উড়ে চলেছি, তার কোন হদিস্ই পাওয়া যায়নি।

কুয়াশার মধ্যে দিয়ে, কুয়াশার ওপর দিয়ে, কিম্বা ওপর নীচে কুয়াশায় ঢাকা পর্দার মাঝখান দিয়েই আমাদের উড়ে যেতে হয়েছে আঠারো ঘণ্টা মত। কুয়াশা নিয়ে কবিতা লেখা চলে কিন্তু আকাশে ওড়ার সময় কুয়াশার মত বিপদ আর কিচ্ছু নেই। উড়ন্ত প্লেন থেকে কুয়াশার জন্য যখন দিগন্ত দেখা যায় না, তখন নিজের অবস্থান সম্বন্ধে কোন ধারণাই আর থাকে না। কোথায় কি ভাবে আমরা ফ্লাই করছি, তা অধুনা আবিষ্কৃত কিছু যন্ত্রের সাহায্যেই জানা কিছুটা সম্ভব। চোখ কানের ওপর বেশী বিশ্বাস না রেখে তাই যন্ত্রের ওপরই বেশী নজর রাখা ভাল।"

মেয়েদের মধ্যে যাত্রী হিসেবে তিনি তো প্রথম আটলান্টিক পাড়ি দিলেন। চার বছর পর, ১৯৩২ সালের মে মাসে, তিনিই আবার প্রথম মহিলা বৈমানিক যিনি একা একটি এরোপ্লেনে আমেরিকা থেকে ইউরোপে পাড়ি দিয়েছিলেন। এই অসাধ্য সাধন তিনি করেছিলেন মাত্র সওয়া তেরো ঘণ্টায়। এর আগে এত অল্প সময়ের মধ্যে কেউ এই পথ অতিক্রম করতে পারেননি।

আটলান্টিক পাড়ি দেবার জন্য অ্যামেলিয়ার প্লেনখানা ছিল "লক্‌হিড-ভেগা"—একটিমাত্র পাঁচশো অশ্বশক্তির ইঞ্জিন। চারশো কুড়ি গ্যালন পেট্রোল নিয়ে প্লেনখানার পাড়ি দেবার পাল্লা ছিল প্রায় তিন হাজার দুশো মাইল। আমেরিকার নিউফাউণ্ডল্যাণ্ড থেকে তিনি টেক অফ্ করলেন। ভয়-ডর কাকে বলে কিছুই জানেন না তিনি। মেয়েরাও যে দুঃসাহসিক এ-কাজ করতে পারেন সেটাই প্রমাণ করা তাঁর অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল। আত্মবিশ্বাসে ভরপুর তিনি। এই

অভিযান তাঁর কিন্তু মোটেই আরামদায়ক এবং বিপদমুক্ত ছিল না।

ঘণ্টা কয়েক ফ্লাই করার পরই তাঁর প্লেনের অল্টিমিটার (উচ্চতা মাপবার যন্ত্র) বিকল হয়ে যায়। কুয়াশার মধ্যে দিয়ে অন্ধের মত উড়ে চলেছেন তিনি। কিছুই নজরে আসে না। সমুদ্রের কত উঁচু দিয়ে উড়ে চলেছেন বুঝবার কোন উপায় নেই। তাই তিনি কখনও হয়তো নেমে আসছেন একেবারে সমুদ্রের জলের সামান্য কিছু উঁচুতে যেখান থেকে জলের ঢেউ পর্যন্ত দেখা যায়, নয়তো উপরে উঠে যাচ্ছেন যতক্ষণ না প্লেনের ডানায় সামান্য কিছু বরফ জমতে দেখা যাচ্ছে। আরও একটা কাণ্ড ঘটলো। নিউফাউণ্ডল্যাণ্ড ছাড়ার ঘণ্টা চারেক পর হঠাৎ পিছনে তাকিয়ে দেখেন, সর্বনাশ! ইঞ্জিনের এক্সহস্ট্ পাইপ থেকে আগুনের হলকা বেরুচ্ছে। মনে হল, এক্সহর্স্ট পাইপ ফেটে গিয়েছে বোধহয়। কিছুক্ষণের চেষ্টায় আগুন তিনি আয়ত্তে আনলেন। কিন্তু বিপদের ওপর আর এক বিপত্তি। কথায় বলে, বিপদ একা আসে না। পেট্রোল গেজটাও সামান্য লিক করছে। চুইয়ে চুইয়ে পেট্রোল পড়ছে। তাঁর আশঙ্কা হল, এই বুঝি চোয়ানো পেট্রোলে আগুন ধরে গিয়ে প্লেনখানা ফেটে পড়ে। কিন্তু না, বরাত তাঁর ভালই। এসব কিছুই হল না তাঁর। বিপদ তিনি কাটিয়ে উঠলেন। শেষ পর্যন্ত তিনি কন্‌নিমারা (Connemara)-র কাছে আয়ারল্যাণ্ডের তীর দেখতে পেলেন। কিছুটা উত্তরে গিয়ে, ডেরীর কাছে নেমে পড়লেন তিনি।

এই অসামান্য সাফল্যের পর থেকেই তিনি বিখ্যাত বৈমানিকদের একজন হয়ে গেলেন।

অ্যামেলিয়া ইয়ারহার্ট পরে বৈমানিক হিসাবে ইতিহাস সৃষ্টি করেছিলেন। অমন সুদক্ষ বৈমানিক খুব কম জন্মেছেন। চার্লস লিণ্ডবার্গ বৈমানিক হিসাবে যেমন একটা কিংবদন্তী, ইয়ারহার্টও তেমনি। অ্যামেলিয়ার গুণগ্রাহীরা তাই তাঁকে আদর করে ডাকতেন "লেডী লিণ্ডবার্গ" বা শর্টে "লেডী লিণ্ডী" বলে। বিমান ইতিহাসে কত রেকর্ড যে তিনি সৃষ্টি করেছেন, তার ইয়ত্তা নেই। খ্যাতি এবং প্রতিষ্ঠা তিনি যত পেয়েছিলেন, বিনয় এবং সারল্য তাঁর তত বেড়ে



বিখ্যাত মহিলা বৈমানিক অ্যামিলিয়া ইয়ারহার্ট
যিনি প্রশান্ত মহাসাগরে হারিয়ে গেলেন
২রা জুলাই ১৯৩৭ সালে।

গিয়েছিল। মুখে তাঁর সর্বদাই একটি মিষ্টি হাসির আমেজ লেগে থাকতো। অমন অমায়িক, নম্র এবং ভদ্র বৈমানিক খুব কম দেখা গিয়েছে। সব ব্যাপারেই বৈমানিকদের মধ্যে অ্যামেলিয়া ছিলেন অনন্যসাধারণ। সবাই যা করে থাকেন, তিনি তার থেকে অসাধারণ কিছু একটা করবেনই।

জানুয়ারী ১৯৩৫ সাল।

হনলুলু থেকে ওকল্যাণ্ড ক্যালিফোরনিয়া ২৪০৮ মাইল। একা একটানা উড়ে এই দুস্তর দূরত্ব তিনি প্রশান্ত মহাসাগরের ওপর দিয়ে পাড়ি দিলেন প্লেনে। সময় লাগালো তাঁর আঠারো ঘণ্টা পনেরো মিনিট। পুরুষ বৈমানিকেরা যা সাহস করেননি, মেয়ে অ্যামেলিয়া তাই সম্ভব করলেন। খবরটা শুনে চম্‌কে গেলো সবাই। কিন্তু এখানেই অবাক হওয়ার শেষ নয়। মাস চারেক পরেই, 'মে' মাসে, তিনি আরও একটি অসাধ্য সাধন করে বসলেন। মেক্সিকো সহর থেকে নিউইয়র্ক সহরের আকাশ-দূরত্ব প্রায় দু'হাজার একশো মাইল। পথে দশ হাজার ফিট উঁচু পাহাড় টপকাতে হয়। একখানা প্লেন নিয়ে অ্যামেলিয়া একা একটানা উড়ে এই দূরত্ব অতিক্রম করলেন চোদ্দ ঘণ্টা আঠারো মিনিটে! অবাক-হওয়া লোক সব স্তম্ভিত হয়ে গেল।

বহু রেকর্ড করে, বহু বাজি জিতে অ্যামেলিয়া এইবার স্থির করলেন, আর না, এইবার তিনি পৃথিবী ঘুরে আসবেন প্লেনে। এবার আর কোন রেকর্ড-টেকর্ড করা নয়। বিভিন্ন বিমানপথের নানা প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ করাই তাঁর এই অভিযানের উদ্দেশ্য হবে।

১লা জুন ১৯৩৭ সাল।

একখানা লক্‌হিড্ ইলেক্‌ট্রা প্লেনে বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি বোঝাই করে রওনা হলেন তিনি। আমেরিকার ফ্লোরিডার মিয়ামী থেকে তাঁর যাত্রা হল সুরু। বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতিতে ভর্তি এই প্লেনখানাকে সবাই নামকরণ করলেন "উড়ন্ত লেবরেটারী"। এই অভিযানে তিনি আর এবার একা নন। বিখ্যাত অভিজ্ঞ বৈমানিক ক্যাপ্‌টেন ফ্রেড্ নূনান ছিলেন এই প্লেনের ন্যাভিগেটর।

মিয়ামী থেকে অ্যামেলিয়া প্রথমে গেলেন দক্ষিণ আমেরিকার ভেনজুয়েলা। এরপর এল ডাচ গায়েনা। তারপর এল ব্রেজিল। ব্রেজিল থেকে দক্ষিণ আটলান্টিক পার হয়ে তিনি পেঁাছলেন সেনিগাল। আফ্রিকা থেকে চলে এলেন কলকাতার দমদম বিমান বন্দরে। তারিখটা হল ১৭ই জুন ১৯৩৭ সাল। কলকাতায় সে কী বিপুল সংবর্ধনা তাঁর। হবেই তো। এই অভূতপূর্ব অভিযানে পনেরো হাজার তিনশো মাইল আকাশ পথ পাড়ি দেওয়া হয়ে গিয়েছে তাঁর। মেয়ে পাইলট এই কাণ্ড করেছেন? দমদম এয়ার-পোর্টে ভিড় তো হবেই। গড় কষে দেখা গেল, দিনে তিনি ৯০০ মাইল করে পথ চলেছেন। সতেরো দিন হয়ে গেল কিন্তু ক্লান্তি নেই তাঁর এতটুকু! মুখে হাসির আমেজ সব সময়ই লেগে আছে।

কলকাতা ছেড়ে তিনি উড়ে গেলেন রেঙ্গুন হয়ে সিঙ্গাপুর। সেখান থেকে উড়ে গেলেন অস্ট্রেলিয়ার ডারউইন্ সহরে। এরপর এলো নিউগিনি। একমাস হয়ে গেল। প্লেনে পেট্রোল পুরছেন

আর উড়ে চলেছেন। আকাশপথের বৈজ্ঞানিক তথ্য সংগ্রহ করে দেশ থেকে দেশান্তরে পাড়ি দিচ্ছেন তিনি। এমনটি আর কেউ করেনি এর আগে। রেকর্ড করবো না বল্‌লেও রেকর্ড হয়ে চলেছে হরেক রকমের।

২রা জুলাই ১৯৩৭ সাল। তারিখটা মনে পড়লেই এত কষ্ট হয় বলার নয়। নিউগিনির লে সহর থেকে অ্যামেলিয়া টেক্‌ অফ করলেন হাউল্যাণ্ড দ্বীপের উদ্দেশে। আড়াই হাজার মাইল পথ প্রশান্ত মহাসাগরের ওপর দিয়ে উড়ে যেতে হবে তাঁকে। কোথায় যে কি হয়ে গেল, কেউ জানে না। অ্যামেলিয়া হারিয়ে গেলেন এই প্রশান্ত মহাসাগরের মধ্যে! সেইদিনই বিকেলের দিকে বেতারে তাঁর শেষ বার্তা—

"মাটির দেখা এখনও মেলেনি। পেট্রোল যা আছে বড়জোর তাতে আর মাত্র আধঘণ্টা ওড়া চলবে।"

বিপদের এই খবর পেয়ে হৈহৈ পড়ে গেল। সবাই বল্‌লো, বড় আদরের অ্যামেলিয়াকে খুঁজে বার করে উদ্ধার করতেই হবে। বেতারে খবর পাঠিয়ে হাউল্যাণ্ড দ্বীপ এলাকার কাছাকাছি যত সমুদ্র জাহাজ ছিল, সব্বাইকে হারিয়ে-যাওয়া অ্যামেলিয়ার প্লেনের কথা জানিয়ে দেওয়া হল। হাজার হাজার বর্গমাইল তন্ন তন্ন করে খোঁজা স্থরু হয়ে গেল। যুক্তরাষ্ট্র গভর্নমেণ্ট প্রাণপাত করে অনুসন্ধান চালালেন। লেক্‌সিংটন নামে একখানা বিমান-বাহী জাহাজকেও এই কাজে লাগানো হল। এই জাহাজ থেকে এরোপ্লেন উড়ে চারিদিকে খুঁজতে লাগলো অ্যামেলিয়ার প্লেনখানাকে। প্রথমদিনে

ষাটখানা এরোপ্লেন হাজার হাজার বর্গমাইল খোঁজ করলো। পরের দিন চল্লিশখানা প্লেন প্রাণপাত করে সমুদ্রের ওপর উড়ে দেখতে লাগলো কোথাও কিছু পাওয়া যায় কি না। কিন্তু কিছুতেই কিছু হল না! কোথায়ই বা অ্যামেলিয়া, আর কোথায়ই বা তাঁর ভাঙা প্লেন? প্রশান্ত মহাসাগরের নীল জলের ছোট ছোট ঢেউ-গুলোর ওপর সূর্যের আলো পড়ে চিকচিক করছে। অনুসন্ধান-কারীদের মনে হল, সমুদ্র যেন হাসতে হাসতে তাদের ব্যঙ্গ করে ছুয়ো দিচ্ছে! অ্যামেলিয়াকে পাওয়া গেল না।

অ্যামেলিয়া আকাশ জয় করেছিলেন। সেই শূন্য আকাশেই তিনি মিলিয়ে গেলেন একদিন।

সাহারা

আফ্রিকার বিরাট মরুভূমি সাহারা।

সাহারা নামটা শুনলেই মনে হয় ধূধূ করছে বিশাল মাঠ—বালির সমুদ্র। কলকাতার দমদম বিমান কেন্দ্রের উত্তর অঞ্চলে ১৯৭১ সালে "বাংলা দেশের" সর্বহারা বাস্তুহারারা যে সাময়িক আশ্রয় পেয়েছিল সেই আশ্রয় শিবিরের নামকরণ হয়েছিল "সাহারা"। সার্থক এই নামকরণ।

এই শরণার্থী শিবির "সাহারা" কলকাতা বিমান ঘাঁটির দৈনন্দিন কাজের কিভাবে প্রতিকূলতা সৃষ্টি করছিল, এই নিয়ে কাগজে প্রায়ই খবর ছাপা হোতো। বিমান কর্তৃপক্ষরা বলেছিলেন, এই 'সাহারা' শিবির হওয়ার দরুন নাকি দারুণ দারুণ ঝুঁকি নেওয়া হয়েছিল বিমান চলাচলের নিরাপত্তার ব্যাপারে।

কয়েকটি আন্তর্জাতিক বিমান সংস্থা এমন হুম্‌কিও দিয়েছিল যে "সাহারা" থেকে "বাংলা দেশের" শরণার্থীদের অবিলম্বে সরিয়ে না দেওয়া হলে দমদম বিমান ঘাঁটি দিয়ে তাদের প্লেন চলাচল বন্ধ করে দিতে বাধ্য হবে তারা।

এমন মারাত্মক হুঁশিয়ারির অর্থ এবং তাৎপর্য কি?

বিমান ঘাঁটির রানওয়ের শেষ প্রান্ত থেকে প্রায় আধ মাইল উত্তরে

যশোর রোডের ধারে এই শরণার্থী শিবির "সাহারা"। এরোড্রোমের মধ্যে, রানওয়ের ওপর তো এরা আশ্রয় নেয়নি, তবে আর এত হৈ চৈ করার কি আছে? বিমান চলাচল করার এতে অস্মুবিধাটা কিসের?

কাগজে প্রায়ই লেখা থাকতো, বিমান কর্তৃপক্ষ বল্‌ছেন—কোন এরোপ্লেন overshooting বা undershooting করলে মারাত্মক অঘটন ঘটবে এই "সাহারা" আশ্রয়শিবিরের। হাজার হাজার শরণার্থী এতে মারা পড়তে পারেন।

এরোড্রোমে গিয়ে তোমরা যদি কখনও কোন প্লেনের রানওয়েতে ওঠা-নামা করা দেখে থাকো তাহলে নিশ্চয়ই লক্ষ করেছো যে ওড়বার আগে প্লেনখানা প্যাসেঞ্জার নিয়ে গড়াতে গড়াতে গিয়ে আগে দাঁড়ায় রানওয়ের এক শেষ প্রান্তে। সেখান থেকে বিকট গর্জন করতে করতে ছুট লাগায় রানওয়ের ওপর দিয়ে। প্লেনখানা ছুটে চলে ঘণ্টায় দশ, বিশ, ত্রিশ, চল্লিশ, পঞ্চাশ, ষাট··· মাইল বেগে। ছোটার স্পিড ক্রমেই বাড়তে থাকে। আয়তন এবং ইঞ্জিনের শক্তি অনুপাতে প্রয়োজন মত গতি পেয়ে গেলেই পাইলট প্লেনখানাকে মাটি থেকে আকাশে তুলে নেয়। প্যাসেঞ্জারদের উদ্বেগ কাটে। বিকট গর্জন করতে করতে প্লেনখানা এরপর ক্রমেই ওপরে উঠতে থাকে। যে চাকার ওপর ভর দিয়ে দৌড় লাগিয়েছিল প্লেনখানা, সেগুলো তখন যন্ত্রের সাহায্যে নিজের বুক-পেটের মধ্যে ঢুকিয়ে নেয় ঠিক যেমন পাখিরা তাদের পা গুটিয়ে নেয় ওড়বার পরই। বাতাস থেকে বাধা কমানোর জন্যই এই ব্যবস্থা। নামবার আগে, যন্ত্রের সাহায্যে আবার চাকাগুলো নামিয়ে দেওয়া হয়। কারণ রানওয়েতে নামবার পরও

আবার প্লেনখানাকে অনেকখানি দৌড় করানো হয় দাঁড় করাবার আগে। এইজন্যই তো প্রয়োজন হয়েছে রানওয়ের।

কোন প্লেন রানওয়েতে নামবার আগে বেশ কয়েক মাইল দূর থেকে পাইলট প্লেনখানাকে রানওয়ের সঙ্গে একলাইনে করে নেয়। তারপর ধীরে ধীরে নীচের দিকে নামতে থাকে। এবং রানওয়ের দিকে এগুতে থাকে। রানওয়ের একেবারে শেষ প্রান্তে কিন্তু মাটি ছোঁবার কথা নয় প্লেনখানার। রানওয়ের শেষ প্রান্ত থেকে বেশ খানিকটা রানওয়ের ভিতরে এসে, তবেই প্লেনখানা মাটি ছোঁয়। রানওয়ের দুদিকেই এই মাটি ছোঁবার জায়গাটা (Touchdown Point) চিহ্ন করা থাকে মোটা মোটা সাদা লাইন দিয়ে। রাতের অন্ধকারে প্লেন নামবার জন্য রানওয়ের ধারে বিশেষ ধরনের ইলেকট্রিক বাতি জ্বালিয়ে এই চিহ্নের নির্দেশ দেওয়া থাকে। রানওয়ের দুধারে সারি করে ইলেকট্রিক বাতি তো দেওয়া থাকেই, এ ছাড়াও এই বিশেষ ধরনের বাতি দিয়ে "Touchdown Point" এরও নির্দেশ থাকে। প্লেনখানা মাটি ছোঁবার পর প্রচণ্ড গতিতে রানওয়ের ওপর দিয়ে ছুটে চলে ঘণ্টায়···একশো আশি, ষাট, চল্লিশ, বিশ, দশ মাইল স্পিডে। গতি অনেকটা কমে এলে তবেই ব্রেক কষা চলে। স্পিড কমানোর এবং প্লেনখানাকে নামানোর অন্য ব্যবস্থাও বহু প্লেনের বহু রকম। কিন্তু ব্যবস্থা যত রকমই থাকুক না কেন, মাটি ছোঁবার পর, প্লেনখানাকে রানওয়ের ওপর দিয়ে অনেকদূর ছুটতেই হয়। এই জন্যই তো লম্বা রানওয়ের প্রয়োজন বড় বড় বিরাট প্লেনগুলোর জন্য।

নামবার সময়, যেখানে রানওয়ে ছোঁবার নির্দেশ, সেখানে না

নেমে যদি কোন কারণে (সে অনেক কারণেই হতে পারে) প্লেনখানা মাটি ছোঁয় অনেক আগে, তাকে বলে Under Shooting। আর যদি মাটি ছোঁয়া চিহ্নিত জায়গার অনেক পরে বা রানওয়ের অনেক ভেতর দিকে, তাকে বলা Over Shooting। চিহ্নিত জায়গার (Touchdown Point-এর) দু'দশ গজ এদিক-ওদিকের কথা নয়। কয়েকশো গজ এমনকি আধ মাইল এক মাইলও এদিক-ওদিক হয়ে যেতে পারে বিশেষ কোন প্রতিকূল আবহাওয়ায় কিম্বা বিগড়ে-যাওয়া যন্ত্রের জন্য।

অনেক সময় এমনও হয় যে প্লেনখানা ঠিকমত চিহ্নিত Touch-down point-এ নামতে পারছে না দেখে আগে ভাগেই পাইলট প্লেনখানাকে রানওয়েতে না নামিয়ে ইঞ্জিনশক্তি বাড়িয়ে আবার ওপরে নিয়ে যায় এবং আবার একটা চক্কর ঘুরে এসে ঠিকমত চিহ্নিত জায়গায় এসে রানওয়েতে নেমে পড়ে।

এই যে Under Shooting আর Over Shooting, এতে বিপদ হতে পারে মারাত্মক। এমনও হয়, কোন প্লেন কোন বিশেষ বিপদে পড়ে Under Shooting করলো একেবার রানওয়ের বাইরে, তখন দুর্ঘটনা অবশ্যম্ভাবী। যা করেছিল Pan American Airways এর যাত্রীবাহী চার ইঞ্জিন প্লেন Boeing 707 এই কলকাতার দমদম বিমান ঘাঁটিতেই ১৩ জুন, ১৯৬৮ সালে।

দমদমের উত্তর দিক থেকে নামবার সময় এমনি কিছু একটা অঘটন যদি তখন ঘটতো কোন চার ইঞ্জিন যাত্রীবাহী প্লেনের, তখন কি হোতো কল্পনা করতে পারো? "সাহারা" শরণার্থী শিবির তো ছিল দমদম

রানওয়ের উত্তর প্রান্ত থেকে মাত্র আধমাইল দূরে!

যেখানে মাটি ছোঁবার নির্দেশ, সেখানে না নেমে, কোন প্লেন যদি আবার অনেক ভেতরে এগিয়ে গিয়ে রানওয়েতে নামে (Over Shooting করে) তাহলেও ভীষণ অঘটন ঘটতে কতক্ষণ? প্লেনখানার প্রচণ্ড দৌড় তো আর হঠাৎ থামানো যাবে না। প্লেনখানা প্রচণ্ড গতিতে রানওয়ে ছাড়িয়ে গিয়ে crash করবে। দক্ষিণ দিক থেকে নামা কোন প্লেনের এই অবস্থা হলে, সেও গিয়ে পড়তো হয়তো ওই "সাহারায়"।

আবার এমনও যদি হয়, কোন প্লেন দক্ষিণ দিক থেকে উড়লো উত্তর মুখো হয়। ওড়বার পরই (বা ওড়বার সময়ই) যদি ইঞ্জিন অকেজো হয়ে যায়, তখনও প্লেনখানা crash land করবে রানওয়ে-লাইনের উত্তর প্রান্ত শেষ হবার পরই। ফল হবে ওই একই রকম সাংঘাতিক।

এই জন্যই তো এত সাবধানবাণী। রানওয়ে লাইনের দুদিকেই বেশ কিছুদূর পর্যন্ত বিপদ যেন ওৎ পেতে বসে আছে। ও অঞ্চল থেকে তফাৎ যাও।

মেডে মেডে মেডে

সালটা মনে নেই। ১৯৫৬ কি ১৯৫৭ হবে বোধ হয়।

শীতকাল, ভোর থেকেই ঘন কুয়াশা। বেলা বাড়তে কিছুটা কেটেছে। আকাশ কিন্তু পরিষ্কার হয়নি। ধোঁয়াটে ভাবটা রয়ে গিয়েছে তখনও। বেলা প্রায় দশটা। বম্বের সান্তাক্রুজ এয়ারপোর্টে সবে দপ্তরে পৌঁছেছি আমি। দৈনন্দিন রুটিন মাফিক একবার কণ্ট্রোল টাওয়ারে গিয়েছি, সেখানের বেতার যন্ত্রগুলো সব ঠিকঠাক কাজ করছে কিনা দেখে নিতে।

টাওয়ার অফিসার দাশগুপ্তর সঙ্গে এটা-ওটা কথা হচ্ছে।

"শীতের সকালে এক কাপ করে চা হলে মন্দ হ'ত না।" বলে একটা চেয়ারে বসে পড়লাম আমি।

"নিশ্চয়ই এ আর বল্‌তে।" দাশগুপ্ত উত্তর করলেন। পিওনকে ডেকে এক পট চায়ের অর্ডার হয়ে গেল।

হঠাৎ বেতার টেলিফোনে শোনা গেল, "মেডে মেডে মেডে"।

দাশগুপ্ত হুমড়ি খেয়ে কণ্ট্রোল টেবিলের কাছে চলে গেলেন।

"মেডে মেডে মেডে, হারিয়ে গেছি আমি। দয়া করে পথ বাতলান।"

কী করুণ এই কাকুতি!

এ মিনতির মধ্যে কিন্তু ভয়ডরের ভাব নেই। উত্তেজনার ভাষা নেই। রীতি মাফিক নিয়ম বাঁধা নির্দেশ চাইছেন একটি ভ্যামপায়ার ফাইটার প্লেনের পাইলট সান্তাক্রুজ কণ্ট্রোল টাওয়ারের কাছ থেকে। চম্‌কে উঠলেন কণ্ট্রোল অফিসার। আমিও।

সাড়া পড়ে গেল সারা এয়ারপোর্টে।

চরম বিপদে এবং আসন্ন বিপদের আশঙ্কায় জাহাজ যেমন "এস্. ও. এস্" পাঠায় বেতার টেলিগ্রাফিতে, বেতার টেলিফোনেতে সেই রকম কথায় বলা হয়, "মেডে, মেডে, মেডে"।

দিগ্‌দর্শন কাঁটার ওপর নজর রেখে দাশগুপ্ত নির্দেশ দিলেন, "আপনার বেয়ারিং ৩০৪।"

প্লেনখানার পাইলট কথা বল্‌ছেন ভি. এইচ. এফ. রেডিও টেলিফোনিতে। কথা বল্‌লেই কণ্ট্রোল টাওয়ারে রাখা একটি যন্ত্রের বৃত্তাকার ডায়েলে কাঁটা ঘুরে দেখিয়ে দিচ্ছে, প্লেনখানা সান্তাক্রুজ এয়ারপোর্টের কোন্ দিক থেকে কথা বল্‌ছে। শ' খানেক মাইল পর্যন্ত এই যন্ত্রটি কার্যকরী। তার মানে প্লেনখানা সান্তাক্রুজ এয়ারপোর্ট থেকে খুব একটা দূরে নেই।

প্লেনখানা সঙ্গে সঙ্গে উত্তর করলো, "৩০৪। মুখ ঘোরালাম, এইবার বলুন ?"

পাইলটের এইটুকু কথাতেই নূতন দিগ্‌দর্শন হয়ে গেল। নির্দেশ গেল, "৩০০।"

যে নির্দেশ যাচ্ছে টাওয়ার থেকে, সেটি আবার একবার বলে নিচ্ছে প্লেনের পাইলট, চেক্ করে নেবার জন্য। আর এই চেক্ করে নেবার

সময়ই টাওয়ার অফিসার আবার দেখতে পাচ্ছেন সরে-যাওয়া প্লেন-খানার নূতন অবস্থান। প্লেনের প্রচণ্ড গতিতে প্রত্যেক দণ্ড, মুহূর্ত মূল্যবান। তাই ঐ সময় যতটা পারা যায় কম কথায় কাজ সারতে হয়। পাইলট নির্দেশ শুনছেন আর প্লেনের মুখ ঘোরাচ্ছেন সান্তাক্রুজ এয়ারপোর্টের দিকে আসার জন্য। ইংরেজিতে একে বলে, "হোমিং।" বাংলায় বলা চলে, "ঘরে-ফেরা।" বেতার টেলিফোনিতে পাইলট চেক্ করলেন, "৩০০। আবার বলুন।"

—"২৯৮।"

—"২৯৮। এইবার ?"

—"২৯৬।"

—"২৯৬। এইবার ?"

এইভাবে চল্‌তে লাগলো একটানা বেয়ারিং দেওয়া। দু' মিনিটে গোটা পঁচিশ বেয়ারিং এইভাবে দেবার পর দাশগুপ্ত বল্‌লেন, ২৮০, ৯০।২৭০-এর যে রানওয়ে আছে, তা আপনার জন্য রেডি। এতে নামতে না পারেন তো অন্য রানওয়েতেও চেষ্টা করতে পারেন। সমস্ত এরোড্রোম আপনার জন্য ক্লিয়ার।

এই সঙ্গে দাশগুপ্ত রানওয়ের ওপরে বায়ুর গতি এবং বেগ, সাদা চোখে দৃষ্টির দূরত্ব (এইসব প্রত্যেক আধ ঘণ্টা অন্তর আবহাওয়া অফিস থেকে পাঠানো কাগজ দেখে) বলে দিলেন।

—"২৮০। ধন্যবাদ। কিন্তু সান্তাক্রুজ এয়ারপোর্ট এখনও নজরে আসছে না। জ্বালানি ফুরিয়ে এলো।"

—"২৭৫। আপনার ইমারজেন্‌সি ল্যান্‌ডিং-এর জন্য আমরা

প্রস্তুত।"

—"২৭৫। সমুদ্রের ওপর থেকে খুব আবছা সান্তাক্রুজ দেখতে পাচ্ছি। নেমে আসছি। এইবার বলুন।"

—"২৭০।"

—"২৭০। ঠিক আছে। কিন্তু জ্বালানি ফুরিয়ে গেল। গ্লাইড করে চেষ্টা করছি আমি। ইমারজেন্সি।"

চারিদিকে সাইরেন বাজছে।

সারা এয়ারপোর্ট এলার্ট পেয়ে থম্‌থম্ করছে। কি হয়, কি হয়! টেলিফোনের পর টেলিফোন করে যাচ্ছে এরোড্রোম কর্তৃপক্ষ। এয়ারপোর্টের ফায়ারটেণ্ডার, অ্যাম্বুলেন্স, সব রেডি। বম্বে শহরের ফায়ার ব্রিগেডের গাড়িও এসে পড়লো বলে।

দুটো রানওয়ে এমনকি ট্র্যাক্সি ট্র্যাকগুলো (যে রাস্তা ধরে প্লেনগুলো এপ্রন থেকে রানওয়ের ওপর যায় গড়াতে গড়াতে) সব পরিষ্কার। কোথাও কোন বাধাবিপত্তি নেই। হুমড়ি খেয়ে প্লেনখানা কোথায় কোন্‌খানে নামবার শেষ চেষ্টা করবে তা কে বলতে পারে?

পাতলা কুয়াশার মধ্যে দিয়ে হঠাৎ প্লেনখানাকে যেন একবারটি দেখা গেল। শেষ চেষ্টা করেও প্লেনখানা কি রানওয়ের ওপর শেষ পর্যন্ত নামতে পারলো না? একটু পরেই টাওয়ার থেকে আবার যেন মনে হ'ল, এয়ারপোর্টের এক প্রান্তে প্লেনখানা হুমড়ি খেয়ে পড়লো। বায়নাকুলার দিয়ে দেখা গেল এই ক্র্যাশ ল্যাণ্ডিং-এর সম্ভাব্য জায়গাটুকু। তারপরই সব চুপচাপ। না কোন আগুন দেখা যাচ্ছে, না শোনা গেল কোন শব্দ। কুয়াশায় চেপে বসা এয়ারপোর্টটা

যেন আরও বেশী থম্‌থম্‌ করতে লাগলো।

ক্র্যাশ টেণ্ডার, এয়ারপোর্ট হেল্‌থ অ্যামবুলেন্স, এয়ারপোর্ট জিপ সব পড়ি-কি-মরি করে ছুটে চল্‌লো ক্র্যাশ করা প্লেনখানার উদ্দেশে। আমিও ছুটলাম আমাদের একখানা জিপ্‌ নিয়ে।

এয়ারপোর্টের পশ্চিম প্রান্তে পাওয়া গেল সদ্য ক্র্যাশ করা প্লেন-খানাকে। মাঝখান থেকে ফেটে দেহটা তার দু' টুকরো হয়ে গিয়েছে। ছোট্ট একটা খেজুর গাছের গোড়ায় মুখের দিকটা তার আটকে রয়েছে। পনেরো বিশ গজ দূরে পড়ে আছে দেহের পিছন দিকটা। এরও কিছুটা দূরে প্লেনখানা প্রথম মাটি ছুঁয়ে ভেঙে গিয়েছে। এখানে-ওখানে দু'চারটে অঙ্গ তার ফেটে ফুটে ভেঙেচুরে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে পড়ে রয়েছে। চারিপাশে লজ্জাবতীলতা আর কাঁটা গাছের ঝোপ। জ্বালানি খতম হয়ে যাওয়াতে মনে হয় আগুন লাগেনি প্লেনখানাতে।

ছুটে সবাই ভাঙা প্লেনখানার দিকে এগিয়ে গেলাম, গাড়িগুলো রাখতে হ'ল বেশ কিছুটা দূরে।

আশ্চর্য হয়ে দেখি, প্লেনের কক্‌পিট্‌ থেকে নেমে পাইলট হেঁটে চলে আসছেন আমাদের দিকে। অক্ষত দেহ! বিড়বিড় করে কি যেন বল্‌ছেন তিনি। আরও কিছুটা এগিয়ে গিয়ে শুনি, তিনি কেবলই বলে চলেছেন, "এঃ, পায়ে বড় কাঁটা ফুট্‌ছে, এক পাটি জুতো কোথায় যে হারিয়ে গেল কে জানে!"

অ্যামবুলেন্সে এয়ারপোর্ট হেল্‌থ অফিসার এসেছিলেন। তিনি চিৎকার করে পাইলটকে বললেন, "আমি এয়ারপোর্ট হেল্‌থ অফিসার। আমার নির্দেশ মানুন, আপনি স্ট্রেচারে শুয়ে পড়ুন।"

ছ'জন স্ট্রেচার বেয়ারা একখানা স্ট্রেচার নিয়ে ছুটে এসেছে।

কিন্তু কে কার কথা শোনে?

কাছে এসে পাইলট ডাক্তারের হাত ধরে বল্‌লেন, "আমি একদম ঠিক আছি ডাক্তার। ঘাবড়াবেন না। চলুন গাড়িতে। একটা পায়ে জুতো না থাকায় ঝোপঝাড়ের কাঁটাগুলো পায়ে বড় বিঁধছে।"

শক্ থেকে অনেক কিছু হতে পারে। মাথায় লেগে ভেতরে রক্ত-ক্ষরণ হচ্ছে কিনা কে বলতে পারে? স্ট্রেচারে শুয়ে পড়বারর্ক ় াণী ডাক্তার বোধ হয় এইজন্যই পাইলটকে বারে বারে দিচ্ছিলেন। তর্কাতর্কি করতে করতে অপেক্ষারত গাড়িগুলোর কাছে এসে গেলাম আমরা। পাইলটকে নিয়ে ডাক্তার আমাদের জিপে উঠলেন। আমি লাফিয়ে ওই জিপেরই পিছনে উঠে বসলাম।

বলিহারি যাই পাইলটকে! নিশ্চিত মৃত্যু থেকে বেঁচে গিয়ে, পায়ে সামান্য কাঁটাঝোপের খোঁচা লাগছে বলে অস্থির হয়ে পড়ছিলেন তিনি! শকেতেই হয়তো ওইরকম কিছু করছিলেন কিনা কি জানি!

পাঁচ মিনিটের মধ্যেই পাইলটকে টাওয়ারে নিয়ে আসা হ'ল। পথে পাইলট সান্তাক্রুজ কণ্ট্রোল টাওয়ারের সুখ্যাতিতে পঞ্চমুখ। "ঘরে ফেরার" দিগ্‌দর্শন যন্ত্রের ভূয়সী প্রশংসা করলেন তিনি আমার কাছে। একটুর জন্য তিনি কিন্তু শেষরক্ষা করতে পারলেন না, প্লেনখানা নষ্ট হয়ে গেল। এর জন্য আন্তরিক দুঃখ প্রকাশ করলেন।

আমি ভাবলাম, পাইলটের এভাবে প্রাণে বেঁচে যাওয়া এক

অপ্রত্যাশিত, আশ্চর্য, অদ্ভুত ও অলৌকিক ঘটনা। কথায় সেই যে বলে না, "রাখে কৃষ্ণ মারে কে ?"

পুণা থেকে এয়ারফোর্সের বড় বড় অফিসার সব এসে গেলেন সেই দিনই। এন্‌কোয়ারি বসলো। টাওয়ার আর ক্র্যাশ করা প্লেনের সঙ্গে বেতার টেলিফোনিতে যা কিছু কথাবার্তা হয়েছিল সব কিছু টেপ রেকর্ডে রেকর্ড করা হয়ে গিয়েছিল। তাই হয়ে থাকে। চব্বিশ ঘণ্টাই তা হয়ে চলেছে। সেই টেপ চালিয়ে শোনা হ'ল সব কিছু। প্লেনখানাকে কিভাবে "হোম" করানো হয়েছিল তা বেশ বোঝা গেল।

ক্র্যাশ করা প্লেনখানা দেখেও এলেন এয়ারফোর্স অফিসাররা। এনকোয়ারি চলতে লাগলো।

পরের দিন পাইলটের সঙ্গে আমার আবার দেখা। এনকোয়ারি থেকে চায়ের বিরতির সময় তিনি আমার ঘরে এসেছিলেন। একপট চা নিয়ে আলাপ করছিলাম।

পাইলটের ভাসা ভাসা বড় বড় চোখ দুটো ছলছল করছে!

প্রশ্ন করলাম, "কেমন আছেন ? সব খবর ভাল তো ?"

পাইলট বেদনার সুরে বল্‌লেন, "হ্যাঁ, আমি তো ভালই। কিন্তু"··· কথা শেষ না করে থেমে গেলেন তিনি।

আমি উদ্‌গ্রীব হয়ে তার দিকে তাকিয়ে রইলাম।

আমার সপ্রশ্ন মুখের দিকে দেখে তিনি এবার বল্‌লেন, "আপনাদের দিগ্‌দর্শন যন্ত্রটা দেখুন আমাকে বাঁচিয়ে দিল। কিন্তু"··· বলে আবার চুপ করে গেলেন তিনি।

আমি এবার প্রশ্ন করলাম, "কিন্তু কি ?"

পাইলট তখন অল্প কথায় তার বক্তব্য বলে চল্‌লেন :

পুণা থেকে আমরা দুই বন্ধু দু'খানা ভ্যাম্‌পায়ার ফাইটার প্লেন নিয়ে আকাশে উড়েছিলাম। নিয়মমাফিক রুটিন প্রাক্‌টিস ফ্লাইং করছিলাম সমুদ্রের ওপর। হঠাৎ আকাশ কুয়াশায় ছেয়ে গেল। কিছুই নজরে পড়ে না। দিকভ্রষ্ট হয়ে কোথায় যে ঠিক আছি বুঝতে পারি না। জ্বালানি ফুরিয়ে এলো। পুণা ফিরে যাবার রসদ নেই আর। কি করি পরস্পরের মধ্যে বেতার টেলিফোনিতে আমাদের কথা হচ্ছিল।

আমার বন্ধু বললো, রসদ ফুরিয়ে আসছে, আমি আর কোন বিপদের ঝুঁকি নিতে রাজি নই। কাছেই সমুদ্রের বীচে আমি ইমারজেন্সি ল্যাণ্ডিং করি। পুণা ফেরা অসম্ভব। জুহু কিংবা সান্তাক্রুজ এয়ারপোর্টে যাবার চেষ্টা করাও মূর্খামি।

আমি বল্‌লাম, "গুডবাই, গুডলাক্‌। আমি কিন্তু একবার শেষ চেষ্টা করে দেখতে চাই। সান্তাক্রুজ এয়ারপোর্টে "হোম" করার চেষ্টা বাতুলতা, তবুও। উত্তর পেয়েছিলাম, উইশ ইউ গুডলাক এণ্ড গুডবাই।

তখনই আমি "মেডে মেডে মেডে" বলে সান্তাক্রুজকে ডাকি। আমি তো দেখুন বেঁচে গেছি। কিন্তু আমার বন্ধু শুন্‌ছি বীচ থেকে মাত্র কয়েক গজ দূরে জলের মধ্যে পড়ে গিয়ে নিজেকে আর প্লেন থেকে বের করে আনতে পারেনি! ডুবে মারা গেছে সে! প্লেনখানাও নষ্ট হয়ে গিয়েছে।

আমার দু'হাত দিয়ে পাইলটের ডানহাতখানা ধরে তাকে সমবেদনা জানানো ছাড়া আর কিছু বোধ হয় আমার করার ছিল না।

মধুরহাসিনী এয়ার-হোস্‌টেস্‌

এয়ার-হোস্‌টেস্‌দের নিয়ে গল্প হচ্ছিল।

তাদের সাজপোশাক, চলন-বলন-ধরন এইসব নিয়ে কত বাঁকা ইঙ্গিতই না করছিল আমার শ্যালিকা—"বলুন তো জামাইবাবু," শোভা বললো, "ওই যে ওদের হাসি, ও কি সরল না নকল ?"

আমি বললাম, "নকল, নকল, মানে ওদের সব কিছুই নকল।"

শোভা যেন জোর পেয়ে গেল আমার উত্তরে। স্বামীর দিকে কটাক্ষ করে আমাকেই আবার প্রশ্ন করলো, "আর ওই আতিথ্যের আদিখ্যেতা আমি দেখতে পারি না দু' চক্ষে। আন্তরিকতার বালাই নেই এতটুকু, খালি গায়ে-পড়া ঢলানি !"

আমি হাসতে হাসতে মন্তব্য করলাম, "ওই আদিখ্যেতাটাই তো ওদের চাক্‌রি !"

শ্যালিকা খুশিতে ভরপুর। এমন একমত হওয়া শ্রোতা বোধ হয় সে এর আগে আর কখনও পায়নি কোথাও।

শ্যালিকার স্বামী নিরুত্তর।

"অমন চুপ করে বসে আছো যে বড় !" স্বামীর দিকে তাকিয়ে শোভা এবার শুধালো— "শুনলে তো ? ওদের নিয়ে আর এবার থেকে আদিখ্যেতা কোরো না তুমি, বুঝলে ?"

শ্যালিকার একথারও কোন উত্তর দিলেন না তার স্বামী।

পকেট থেকে সিগারেটের প্যাকেট বার করে একটি সিগারেট ধরালেন তিনি। আমার দিকে অনেকক্ষণ চেয়ে রইলেন। আমার মনের ভেতরটা যেন দেখবার চেষ্টা করছেন।

শোভার স্বামী প্রভাতবাবু চাকরি করেন লণ্ডনের হিথ্‌রো এয়ার-পোর্টে বি. ও. এ. সি. কম্পানিতে। ছুটিতে এসেছেন কলকাতায়। সস্ত্রীক।

দরদী গম্ভীর গলায় প্রভাতবাবু এবার আমায় প্রশ্ন করলেন, "মেয়েদের চাক্‌রি করার মধ্যে সবসময়ই আমরা খারাপ দিকটা বড় করে দেখি কেন বলতে পারেন দাদা?"

আমি কিছু একটা উত্তর দেবো ভাবছি; তার আগেই শোভা বলে বসলো: "মেয়েগুলো চাক্‌রি করে নষ্টামি করার জন্য, এটা কে না জানে।"

স্ত্রীর মন্তব্যের ওপর কোন রকম গুরুত্ব না দিয়ে প্রভাতবাবু আবার আমার উদ্দেশ্যে বললেন: "কেরানী, নার্স, সেলস্‌ গার্ল, এয়ার-হোস্‌টেস্‌ এরাই সব যেন চোর দায়ে ধরা পড়েছে! পুরুষদের মধ্যেও তো অনেকে আছেন যাদের মধ্যে সব কিছুই নকল। সরলতার নামগন্ধ নেই তাদের চরিত্রে। নৈতিক চরিত্র তাদের কত নীচু! নষ্টামিতেই তাদের আনন্দ। তাদের নিয়ে কৈ এত হৈ চৈ করি না তো আমরা?"

"আরম্ভ হল লেকচার"—বলে শোভা আসর থেকে উঠে পড়লো। বললো: "আমি চা নিয়ে আসি।"

শোভা অন্য ঘরে চলে গেলে প্রভাতবাবু আবার শুরু করলেন ঃ "প্লেনের কোন প্যাসেঞ্জার সিট্‌বেল্টটা ঠিকমত বাঁধতে পারছেন না, দেখবেন, এয়ার-হোস্‌টেস্ কোন রকম মন্তব্য বা বিরক্তি প্রকাশ না করেই কেমন চট্ করে তার সিট্‌বেল্টটা বেঁধে দিয়ে গেলেন। মায়ের কোলে কোন ছোট ছেলে কি মেয়ে একটানা কেঁদেই চলেছে। কোলে তুলে নিয়ে কি কায়দায় কান্না থামিয়ে তাকে তার মায়ের কোলে নামিয়ে দিয়ে চলে যায় এই এয়ার-হোস্‌টেস্‌রা। সময়মত চা কফি খাওয়ানো, যাত্রা লম্বা হলে বিভিন্ন রুচির হরেক রকমের প্যাসেঞ্জারদের লাঞ্চ-ডিনার পরিবেশন করার কী সুন্দর দক্ষতার পরিচয় দেয় এই এয়ার-হোস্‌টেস্‌রা তা দেখলে অবাক হতে হয় না কি? আপনি আপনার মাথার ওপর বোতাম টিপলেন। সঙ্গে সঙ্গে এয়ার-হোস্‌টেস্ এসে হাজির। কি চাই? না একখানা ছবির বই। এক মিনিটের মধ্যে ছবির বই এসে হাজির! এসবই কি নিছক নকল? আপনিই বলুন দাদা, এর মধ্যে আদিখ্যেতাটা কোথায়?"

ভেবে দেখলাম, কথাগুলো ফেল্‌না নয়—সত্যই। কিন্তু আমি নিরুত্তরই রইলাম।

প্রভাতবাবু বলতে লাগলেন, "পুরুষ প্যাসেঞ্জারই বরং এমন আছেন যারা এই আতিথ্যের আতিশয্যকে ভুল বুঝে অনেক কিছু অশোভন কাণ্ড করে বসেন, যাকে বলা চলে শিষ্টাচারের বিকৃতি। তাই দেখবেন, এয়ার প্যাসেঞ্জারদের জন্য অনেক কিছু উপদেশমূলক নির্দেশবাণী অনেক এয়ার-লাইনস্ প্যাম্‌প্লেট ছাপিয়ে প্যাসেঞ্জারদের হাতে বিলি করে দেয়। এতে এয়ার-হোস্‌টেস্‌দের কর্তব্য এবং করণীয়

সম্বন্ধেও অনেক কিছু লেখা থাকে।"

পোড়া সিগারেটের টুকরোটা অ্যাসট্রের মধ্যে পুরে দিয়ে প্রভাতবাবু দুঃখ করে বলতে লাগলেন, "বিনা পয়সায় লণ্ডন-কলকাতা রুটে এতবার ফ্লাই করলাম দুজনে, কত আপ্যায়িত করলো নানা ধরনের এয়ার-হোস্টেস্ কিন্তু কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা দূরে থাক, এদের সম্বন্ধে একটু ভাল কথাও আপনার শ্যালিকা বরদাস্ত করতে পারেন না! কেন বলুন তো?"

আমি মন্তব্য করলাম: "মেয়েদের ব্যাপার তো। তোমাকে অন্য কেউ যত্ন করেন এটা বোধহয় তোমার স্ত্রী সহ্য করতে পারেন না।"

প্রভাতবাবু হেসে ফেললেন। আমিও হাসতে লাগলাম।

"এত হাসির কথা কি হল" বলতে বলতে শোভা চা-খাবারের ট্রে নিয়ে ঘরে এলো।

আমি বললাম, "না এমনি। এয়ার-হোস্টেস্দের নিয়ে গল্প হচ্ছে।"

"এখনও আপনারা ওদের নিয়ে হাসাহাসি করছেন! বলিহারি আপনাদের রুচি!"

চায়ের ট্রে সেণ্টার টেবিলে রাখতেই, "খারাপ কথা কিছু হয়নি ওদের নিয়ে"—এই বলে হাত ধরে শোভাকে পাশে বসিয়া দিলাম। প্রভাতবাবু এক কাপ চা তুলে নিয়ে চামচ দিয়ে চা নাড়তে নাড়তে বললেন, "হ্যাঁ শুনুন দাদা, এয়ার-হোস্টেস্ বারবারা হ্যারিসনের গল্প বলি শুনুন। গল্প নয় ঘটনা।"

শোভার দিকে ফিরে বললেন, "তুমিও মন দিয়ে শোনো। তারপর এয়ার-হোস্টেস্দের সম্বন্ধে তোমার মন্তব্য আবার শুনবো।"

৮ই এপ্রিল, ১৯৬৮ সাল। তারিখটা মনে আছে এই জন্য যে অমন লোমহর্ষক কাণ্ড আমি জীবনে কখনও দেখিনি।

দুপুর গড়িয়ে বিকেল হয়েছে। আমি তখন হিথ্রো এয়ারপোর্টে ডিউটিতে।

ছোট্ট কাঠামোর সদাহাস্যময়ী এয়ার-হোস্টেস্ বারবারা হ্যারিসন যথারীতি বি. ও. এ. সি.-র প্যাসেঞ্জারদের স্বাগত জানালেন তাদের বোয়িং ৭০৭ প্লেনে। প্লেনখানা ছাড়ছে লণ্ডনের হিথ্রো এয়ারপোর্ট থেকে সুইজারল্যাণ্ডের জুরিখ এয়ারপোর্ট-এর উদ্দেশে। প্লেনের পেটের মধ্যে ১১৬ জন প্যাসেঞ্জার। একজন স্টুয়ার্ড আর এয়ার-হোস্টেস্ বারবারা। দুজনে চটপট সবাইকার সিট্-বেল্ট ঠিকমত বাঁধা হয়েছে কিনা দেখে নিলেন। এরপর বারবারা ইমারজেন্সি নির্দেশগুলো তাড়াতাড়ি দেখিয়ে দিলেন। হাসি মুখে বুঝিয়ে দিলেন সব প্যাসেঞ্জারদের। মানে, তেমন কিছু অঘটন ঘটলে কি করতে হবে না হবে। কী ধীর স্থির শান্ত অথচ চটপটে সপ্রতিভ তাঁর রুটিন কাজগুলো! বিপদে কি কি করতে হবে সেগুলোর নির্দেশ দেবার সময় কোন ভয়ের লেশমাত্র নেই তাঁর ভাবভঙ্গিতে, কথাবার্তায়। এতে প্যাসেঞ্জারদের মনোবল বাড়ে বৈ কমে না। বারবারার বক্তব্য, "মা ভৈ! এ তো রোজকার রুটিন ফ্লাইট। কর্তব্য তাই এই সব বলা, দেখানো, শেখানো। উদ্বেগ আশঙ্কার কোন কারণ নেই। ওই যে দেখছেন প্যাসেঞ্জার কেবিনের বোর্ডে আলো জ্বালিয়ে নির্দেশ দেওয়া রয়েছে—"Caution, Fasten your seat belts. No smoking please," আমার এই সব ইমারজেন্সি পরামর্শগুলোও

অনুরূপ। জানি, বেশীর ভাগ প্যাসেঞ্জারদের এসব জানবার কথাগুলো "জল-ভাত" হয়ে গিয়েছে। তবু প্রথম প্লেনে চড়ছেন এমন কেউ থাকেন যদি, তাঁদের জন্যও আমাদের এই কথাগুলো বলে রাখা কর্তব্য। তাই বলা।"

শোভা তার স্বামীকে থামিয়ে দিয়ে বললো—"তুমিও কি সেই প্লেনের প্যাসেঞ্জার ছিলে?"

প্রভাতবাবু বললেন—"না, এই প্লেনে প্যাসেঞ্জার থাকলে, এ কাহিনী আমি এইভাবে হয়তো বলতে পারতাম না।"

"তার মানে? প্লেনখানা অ্যাকসিডেণ্ট করলো নাকি?"

"কাহিনীটা শোনোই না শেষপর্যন্ত, তা হলেই মানেটা বুঝতে পারবে! টুকরো টুকরো খবর নানান জায়গা থেকে, হরেক রকম প্যাসেঞ্জারদের কাছ থেকে যা যোগাড় করেছিলাম, তাই এক জায়গায় করে কাহিনীটা বলছি আমি। তাই মনে হতে পারে যেন আমিই এই ঘটনাটার প্রত্যক্ষদর্শী।"

"এয়ার-হোস্টেসের কি যেন নাম বললে?"

"বারবারা। বারবারা হ্যারিসন্।"

"বারবারা হ্যারিসন্! এর গল্প আগে তোমার কাছে কখন শুনেছি বলে তো মনে পড়ছে না।"

"না, এ কাহিনী আমি আগে বলিনি তোমায়। বড্ড লোমহর্ষক করুণ কাহিনী। যখন ঘটনাটা ঘটেছিল তখন শোনবার মত তোমার শরীর ও মনের অবস্থা ছিল না। ডাক্তারের বারণ ছিল।"

"এপ্রিল ১৯৬৮ সাল?" নিজেকে নিজেই প্রশ্ন করে কি যেন

একটু চিন্তা করেই লজ্জায় মুখ নীচু করলো শোভা।

আমার বুঝতে দেরি হল না, সেই সময় শোভা ছিল অন্তঃসত্ত্বা, তার প্রথম সন্তান হয়েছিল ১৯৬৮ সালের জুলাই-এর কোন একটা তারিখে। প্রভাতবাবু ইতিমধ্যে একটা সিগারেট ধরিয়ে নিয়েছেন। গল্প আবার শুরু হল ঃ

"কণ্ট্রোল টাওয়ারের নির্দেশ নিয়ে প্লেনের চারখানা জেট ইঞ্জিন একটার পর একটা চালু হল। বিকট গর্জন করতে করতে বিরাট দেহখানা ধীরে ধীরে বেঁকিয়ে প্লেনখানা যেন কোন রকমে গদাইলশকর চালে এগিয়ে চললো রানওয়ের শেষপ্রান্তে। এই সব বিরাট প্লেনের মাটিতে চলার ধরন দেখলে কে বলবে ওই অতখানা ভারী শরীর নিয়ে সেটা আকাশে উড়বে! কিন্তু উড়বে ঠিকই। বিজ্ঞানী মানুষের এই তো কৃতিত্ব।

রানওয়ের শেষপ্রান্তে কিছুক্ষণের জন্য দাঁড়িয়ে প্লেনখানা যেন দম নিচ্ছে। আসলে তখন পাইলট তাঁর যন্ত্রপাতিগুলো সব ঠিকঠাক আছে কিনা তাই শেষবারের মত দেখে নিচ্ছেন। এর পরই বেতার টেলিফোনে কণ্ট্রোল টাওয়ার থেকে আকাশে ওড়বার নির্দেশ নিয়ে প্লেনখানা বিকটতর গর্জন করতে করতে রানওয়ের ওপর দিয়ে চলতে শুরু করলো। প্রথমে হাঁটা, যেন চলতেই পারছে না। পরে ছোটা। গতি তার ক্রমেই বাড়তে লাগলো। রানওয়ের অর্ধেক যখন শেষ, তখন কী বিকট তার গর্জন, কী প্রচণ্ড তার গতি! অনেক দর্শকেরই মনে হয়, কি যেন হয় বুঝি এখনই। আকাশ বাতাস মাটি কাঁপতে থাকে। মাটির মায়া যেন পশ্চাতে টানছে তারে। কিন্তু মায়া তার

কাটিয়ে উঠতেই হয়। উচিতমত গতির বেগ পেয়ে গেলেই প্লেনখানা মাটি ছেড়ে আকাশে ভাসতে থাকে, ক্রমেই উঁচুতে উঠতে থাকে। এ প্লেনখানাও তাই করলো। যাকে বলে বিউটিফুল পারফেক্ট টেক অফ। যাঁরা বিদায় জানাতে এসেছিলেন, আত্মীয়-বন্ধু-প্রিয়জন প্যাসেঞ্জারদের, তাঁদের অনেকেই টারমিনাল বিল্ডিং থেকে রুমাল নেড়ে বিদায় সম্ভাষণ জানালেন।"

আমি প্রশ্ন না করে থাকতে পারলাম না—"আচ্ছা, এই রুমাল নেড়ে প্লেনের প্যাসেঞ্জারদের বিদায় সম্ভাষণ জানানোর কোন মানে হয়? প্লেনখানা যখন টেক্ অফ করছে তখন তার পেটের ভেতরে থাকা প্যাসেঞ্জাররা এই রুমাল নাড়া দেখতে পায়?"

উত্তরে প্রভাতবাবু বললেন, "সব কিছুর মানে খুঁজবেন না দাদা। সব কিছুর কি মানে খুঁজে পাওয়া যায়? ওটা একটা সংস্কার বলতে পারেন, রুমাল নাড়াটা বিদায় সম্ভাষণের প্রতীকও বলতে পারেন। রুমাল নাড়া দেখানোটা উদ্দেশ্য নয়।"

"ও, আচ্ছা, বলো তারপর।"

আবার শুরু করলেন প্রভাতবাবু—

"যে চাকাগুলোর ওপর ভর দিয়ে এতবড় বিরাট প্লেনখানা রান-ওয়ের ওপর দিয়ে এতক্ষণ ছুট লাগিয়েছিল সেগুলো কত অনায়াসে প্লেনের পেটের ভিতর ঢুকে গেল! প্লেনের মাথার নীচে যে চাকা ছিল, প্লেনখানা হাঁ করে যেন সেটাকেও মুখের মধ্যে পুরে ফেললো! প্লেনখানা তার গন্তব্য পথে এগিয়ে চললো। কিছুক্ষণ পরেই সেটা আর নজরে এলো না—আকাশের মধ্যে মিলিয়ে গেল যেন…"

আমি কৌতূহলী হয়ে প্রশ্ন করলাম—

"আচ্ছা, আজকালকার প্লেনগুলো টেক্ অফ করার পরই অমন করে চাকাগুলো পেটের মধ্যে, মুখের মধ্যে ঢুকিয়ে নেয় কেন? নামবার আগে, চাকাগুলোকে তো আবার নামাতেই হয়, তা না হলে প্লেনখানা রানওয়ের ওপর নামবে কি করে? তাই না?"

প্রভাতবাবু বুঝিয়ে বললেন:—"প্লেনখানা যখন আকাশে ভেসে চলে তখন তো আর এই চাকাগুলোর, যাকে বলে, আনডার ক্যারেজের প্রয়োজন নেই। প্লেনের প্রচণ্ড গতির জন্য এই আনডার ক্যারেজ অবাঞ্ছিত খানিকটা পিছু টানের সৃষ্টি করে। এটা এড়ানোর জন্যই এই ব্যবস্থা। প্লেনের সার্চলাইটও এইভাবে দরকার মত প্লেনের পেটের ভেতর থেকে বের করা হয়ে থাকে। প্রয়োজন শেষে আবার সেটা পেটের মধ্যে লুকিয়ে নেওয়া হয় বাতাসের নাগাল থেকে।"

"ও আচ্ছা। বুঝেছি। বলো তারপর কি হল। আমরা বড্ড বাগড়া দিচ্ছি তোমাকে।"

শোভার দিকে তাকিয়ে বললাম—"শোভা! আর কোন প্রশ্ন নয়। ওকে কাহিনীটা শেষ করতে দাও আগে। কেমন?"

"বেশ।"

আবার শুরু হল কাহিনী।

"ঘড়িতে তখন বিকেল চারটে সাতাশ।

প্লেনখানা তো টেক্ অফ করে জুরিখ অভিমুখে রওনা হয়ে গেল। মিনিট দুয়েক পরেই হঠাৎ শুনলাম সাইরেনগুলোর আর্তনাদ! একটানা বেজেই চলেছে। সারা এয়ারপোর্টে চাঞ্চল্য। সবাইকার

মুখে এক প্রশ্ন—কি হল ?"

একগাদা ধোঁয়া নিয়ে জুরিখগামী প্লেনখানা হিথ্রো এয়ারপোর্টেই ফিরে আসছে। মানে ফিরে আসার চেষ্টা করছে। শুনলাম, প্লেনখানায় আগুন ধরে গিয়েছে। প্লেনখানা ইমারজেন্সি ল্যাণ্ডিং করার চেষ্টা করছে! অ্যামবুলেন্স, ফায়ার ব্রিগেড; পুলিসের গাড়ি; বি. ও. এ. সি.-র গাড়ি সব এদিক ওদিকে ছোটাছুটি করে রানওয়ের ধারে নিজ নিজ নির্ধারিত স্থানে দাঁড়িয়ে গেল। দাউ দাউ করে জ্বলছে প্লেনখানা। এমন ভয়াবহ দৃশ্য আমি জীবনে কখনও দেখিনি—ভুলতেও পারবো না কখনও। ওই অতগুলো প্যাসেঞ্জারের কথা ভেবে আমার বুকের ভেতরটা কেমন যেন করতে লাগল। জ্বলন্ত প্লেনখানাকে কিন্তু পাইলট রানওয়ের ওপর কোন রকমে নামিয়ে দিলেন।

'সাবাস' বলে উঠলেন সবাই।

কিছুটা ছুটে যাবার পরই, প্লেনখানা ব্রেক কষতে লাগলো। অমন কষে ব্রেক করা কেউ কোনদিনও বোধ হয় দেখেনি। প্লেনখানা যায় বুঝি উল্টে। কিন্তু না, জ্বলন্ত প্লেনখানা কিছুদূর গিয়েই থেমে গেল।

হুস্ করে গাড়িগুলো প্লেনের কাছ থেকে নিরাপদ দূরত্ব রেখে, সেটাকে ঘিরে ফেললো। দমকলের গাড়ি আগুন নেভানোর কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়লো। পিলপিল করে বেরিয়ে আসছে প্যাসেঞ্জাররা। এর যেন শেষ নেই। ওই অত প্যাসেঞ্জার—বেরুচ্ছে তো বেরুচ্ছেই। প্রত্যেক মুহূর্তই মূল্যবান, যে কোন সময় প্লেনখানা ফেটে চৌচির হয়ে যেতে পারে। সে একেবারে যাচ্ছেতাই কাণ্ড। যাঁরা প্লেন থেকে

কোনরকমে হিঁচড়ে টেনে বেরিয়ে আসছেন, তাঁদের সঙ্গে সঙ্গে নিরাপদ দূরত্বে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। কাউকে গাড়িতে, কাউকে অ্যাম্বুলেন্সে, কাউকে চ্যাংদোলা করে। প্লেনের ল্যাজের দিকটা ধোঁয়ায় কিছু দেখাই যাচ্ছে না। প্লেনের ভেতরটাতেও আগুন ঢুকেছে। দমকল-গুলো ক্রমাগত যুদ্ধ করে চলেছে এই মারাত্মক আগুনের সঙ্গে। কিন্তু আগুন নেভানো গেল না। প্লেনখানা রানওয়েতে নামবার মিনিট দুই পরেই আগুনে বিলীন হয়ে গেল। পরে শুনলাম, ১১৬ জন প্যাসেঞ্জার এবং ১১ জন ক্রুর মধ্যে পাঁচ জন ছাড়া সবাই এই জ্বলন্ত নরককুণ্ড থেকে বেরিয়ে আসতে পেরেছে! ওই অতটুকু সময়ের মধ্যে এই এত লোক বেরুলো কি করে? যারা বেরিয়ে আসতে পেরেছিলেন তাদের মধ্যে ৩৮ জন আহত— কেউ কেউ গুরুতরভাবে।

নানান প্যাসেঞ্জারদের কাছে যেসব গল্প শুনেছিলাম তারই কিছুটা বলি এবার। তাহলেই বুঝতে পারবেন এয়ার-হোস্টেস্ বারবারা কী অসাধ্য সাধন করেছিলেন এই আশ্চর্য অদ্ভুত ইভাকুয়েশনে।

হিথ্রো ছাড়বার পর মিনিট দুইও হয়নি; হঠাৎ প্লেনখানা কেমন যেন একটু অস্বাভাবিক ঝাঁকুনি খায়। এর পরই বাঁ ডানার ভেতর দিককার ইঞ্জিনের পিছনে আগুন দেখা দেয়। কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যেই সেই আগুন ভয়াবহ রূপ নিল। স্টুয়ার্ড ছুটে পাইলটের ককপিটে চলে গেল। প্লেনের প্রায় সব প্যাসেঞ্জারই এই আগুন দেখতে পেয়েছেন। লুকোবার কিছু নেই এতে। ভয়ে সবাই সিটিয়ে গেলেন। কথাবার্তা সব বন্ধ হয়ে গেল তাঁদের।

"কি হয় কি হয়" এমনি একটা ভাবনা তখন সবাইকার মনের

মধ্যে। যে কোন মুহূর্তে প্লেনখানা ফেটে যেতে পারে। প্লেনখানা তখন চেপে বাঁয়ে মোড় নিচ্ছে। পাইলট কোন রকমে প্লেনখানাকে হিথ্‌রো এয়ারপোর্টে যতশীঘ্র সম্ভব নামাবার চেষ্টা করছেন। নান্য পন্থা।

কম বয়সী এক দম্পতি এ দৃশ্য আর চোখ খুলে রেখে দেখতে পারলেন না। চোখ বুজে মুখ নীচু করে এ ওর হাত আঁকড়ে ধরলেন। আগুন দেখা গিয়েছিল চারটে উনত্রিশ মিনিটে। তার মানে অন্তত দু মিনিটে যদি প্লেনখানা না ফেটে যায় তাহলেই হয়তো এই জ্বলন্ত প্লেনখানাকে কোন রকমে হিথ্‌রোতে আবার নামাতে পারবেন প্লেনের কমাণ্ডার। পাইলট সেই চেষ্টাই করতে লাগলেন।

স্টুয়ার্ড ছুটে এলেন কেবিনে। ফ্যাকাশে মুখ। কিন্তু আশ্চর্য শান্ত সংযত কণ্ঠে বললেন তিনি—

"আমরা ইমারজেন্‌সি ল্যানডিং করছি। ইমারজেন্‌সি নির্দেশগুলো যথাসাধ্য পালন করবেন। অযথা ভয় পাবেন না। সেফটি বেল্ট-গুলো খুলবেন না, বরং শক্ত করে বেঁধে নিন। মাথা নীচু করে রাখুন। হাত দুটো দিয়ে কান চেপে ধরুন। ভয় কি, আমরা আছি সাহায্য করবো। যা বলা হবে তাই শুনবেন। প্লেনখানা রানওয়েতে থামবার পরই যতশীঘ্র সম্ভব প্লেনখানা থেকে আপনাদের নামিয়ে দেবো আমরা। হুটোপাটি একদম করবেন না, তাতে নামতে আরও দেরি হয়ে যাবে।

এয়ার-হোস্‌টেস্‌ বারবারাকে এখন আর হাস্যময়ী বলা চলে না। কিন্তু হাসির রেশটুকু তবুও মুখে কেমন যেন লেগেই রয়েছে তার! আশ্চর্য। এখন কারও মুখে হাসির চিহ্ন থাকে নাকি? ভগবান ওর

মুখটাই বোধ হয় অমন হাসিমাখা করে দিয়েছিলেন। তাই।

এই ভয়াবহ বিপদের মধ্যে বারবার সিটবেল্টগুলো চেক করতে লাগলেন। ওপরের র‍্যাক থেকে টপাটপ করে বালিশ নামিয়ে প্যাসেঞ্জারদের কোলের ওপর ফেলে দিতে থাকলেন। কী সপ্রতিভ, কী দারুণ চট্‌পটে তার কাজ করবার কায়দা। যেন মেসিন একটা! এরই মধ্যে ছোট দুটি ছেলেকে পিট চাপড়ে একটু সাহস দিয়ে আদর করে, মাথাটা তাদের কোলের ওপর-ফেলা বালিশের ওপর গুজে দিলেন। হাতদুটো ধরে কানের ওপর চাপা দিয়ে দিলেন।

সারা প্যাসেঞ্জার-কেবিন তখন আগুনের তাপে অসহ্য হয়ে উঠেছে। গরমে এবং ভয়ে সবাই ঘেমে নেয়ে যাচ্ছেন। প্লেনের জানলাগুলো আগুনের তাপে গলতে শুরু করেছে। শত সান্ত্বনা সত্ত্বেও মায়ের কোলে একটি শিশু মা-মা করে একটানা কেঁদেই চলেছে। অনেক প্যাসেঞ্জারই তখন নিজেদের ইষ্টদেবতার নাম স্মরণ করছেন। শত চেষ্টা করেও অনেকে আবার ভয়ের কাঁপুনি থেকে রেহাই পাচ্ছেন না। সিট্ বেল্টে বাঁধা অবস্থায় কেঁপেই যাচ্ছেন তারা। আসন্ন মৃত্যু-ভয়।

দু মিনিট যেন দু যুগ।

হঠাৎ প্লেনখানার চাকাগুলো যেন মাটি স্পর্শ করলো। মাটি ছুঁতে এত আনন্দ!

পাইলট অপূর্ব দক্ষতায় জ্বলন্ত প্লেনখানাকে হিথ্‌রো এয়ারপোর্টের রানওয়েতে নামিয়ে দিলেন। চেপে ব্রেক কষে যত শীঘ্র সম্ভব প্লেন-খানাকে রানওয়ের ওপরই দাঁড় করিয়ে দিলেন।

বারবারা তৈরী হয়েই ছিলেন। ফেটে না গিয়ে প্লেনখানা যদি কোন রকমে রানওয়েতে নামতে পারে তাহলে প্যাসেঞ্জারদের বাঁচাবার শেষ চেষ্টা করতেই হবে তাঁকে। সে ব্যবস্থা যত চট্‌পট হয় ততই ভাল। প্রত্যেক মুহূর্ত অমূল্য।

প্লেনের পিছনের দরজায় দাঁড়িয়ে বারবারা চেঁচাচ্ছেন— "দয়া করে একে একে এগিয়ে আসুন।" অনেকে নিজেরাই নামলেন আবার জোর করে কোন কোন ভীতু প্যাসেঞ্জারকে ঠেলে নামিয়ে দিলেন এই বারবারা!

আহত হলেন এতে অনেকে কিন্তু প্রাণে বেঁচে গেলেন তাঁরা। সামনের দিকের প্যাসেঞ্জারদের নামবার সাহায্য করছেন স্টুয়ার্ড সামনের দিকের দরজা দিয়ে আর বারবারা দাঁড়িয়েছেন পিছনের দরজার কাছে। প্যাসেঞ্জারদের অবস্থা বর্ণনাতীত।

এক বৃদ্ধা ভদ্রমহিলা ভয়ে ক্রমাগত ভুল বকে চলেছেন। হাত ধরে টানতে টানতে বারবারা তাঁকে নীচের অ্যাম্বুলেন্সের লোকেদের হেফাজতে ঠেলে ফেলে দিলেন! আর একটি কমবয়েসী মেয়ে ভয়ে অজ্ঞান হয়ে গেছেন। তাঁকেও টেনে নীচে নামিয়ে দিলেন ফায়ার-ব্রিগেডের কর্মীদের সাহায্যে। ছোট ছেলেমেয়েগুলি ঠেলাঠেলি ধাক্কাধাক্কিতে কান্না জুড়ে দিয়েছে। তাদের কোলে করে প্লেনের দরজা থেকে নীচের লোকেদের কোলে ফেলে দিতে লাগলেন বারবারা। অলৌকিক শক্তিতে যেন উদ্দীপ্ত হয়ে গেছেন তিনি।"

আমি রুদ্ধনিঃশ্বাসে প্রশ্ন করলাম—"আর বারবারা? তাঁর নিরাপত্তার কি হল?"

ধরা গলায় প্রভাতবাবু বলতে লাগলেন—

"আগুনের হলকায় পিছনের পথটা যখন বন্ধ হয়ে গেল তখন বারবারা নিজের জীবন বিপন্ন করে এগিয়ে এলেন সামনের দরজার দিকে স্টুয়ার্ডকে সাহায্য করতে। সামনের দরজা দিয়ে পথ করে নিয়ে নিজে তিনি অনায়াসে প্লেনের বাইরে চলে আসতে পারতেন। কিন্তু না, তা তিনি করলেন না। জিদ্ করে আবার প্লেনের পিছন দিকটায় চলে গেলেন তিনি। ভয়ে চলশক্তিহীন দুই মহিলা-প্যাসেঞ্জার পড়ে আছেন সেখানে। আর পড়ে আছেন এক বুড়ি প্যাসেঞ্জার যিনি ভাল করে এমনিই হাঁটতে পারেন না। আর সেই ছোট্ট মেয়েটি? যে মা মা করে কেঁদেই চলেছে। তাকে কে বাঁচাবে? টেনে হিঁচড়ে যেমন করে হোক আগুনের মধ্যে থেকে এঁদের বাইরে বার করে আনতেই হবে। বাঁচাবার শেষ চেষ্টা করতেই হবে। কারও মানা শুনলেন না তিনি। জীবন তুচ্ছ করে বারবারা সেই আগুনের মধ্যে চলে গেলেন। আর ফিরলেন না তিনি। ছোট্ট মেয়েটিকে মায়ের মত কোলে তুলে নিয়ে হাসতে হাসতেই বোধহয় আত্মহুতি দিয়েছিলেন সেই মধুরহাসিনী বারবারা হ্যারিসন। আগুনে পুড়ে যাওয়া বারবারার মৃতদেহের কোলে ছোট্ট একটি মেয়ের মৃতদেহও পরে পাওয়া গিয়েছিল।

আত্মত্যাগ এবং গভীর কর্মানুরাগের জন্য এই কর্তব্য পরায়ণা বারবারাকে বৃটেনের সর্বোচ্চ বেসামরিক সম্মান জর্জ ক্রশ (মরণোত্তর) দেওয়া হয়েছিল।"

কাহিনী শেষে আমি অভিভূত হয়ে পড়লাম। শোভাও তন্ময়

হয়ে শুনছিল এই অবিস্মরণীয় অবিশ্বাস্য ঘটনা যা গল্পের চেয়েও আশ্চর্য অদ্ভুত। গল্প শেষ হলে আমি শুধু বললাম, "এয়ার-হোস্‌টেস্‌দের সম্পর্কে আমার আগের অশোভন মন্তব্য ফিরিয়ে নিলাম আমি।"

শোভার দিকে তাকিয়ে দেখি, গাল বেয়ে তার অশ্রুধারা। ধরা গলায় সেও বল্‌লো—"এয়ার-হোস্‌টেস্‌দের বিরুদ্ধে আমি কোনদিন কোন কথা বলবো না গো।" এরপরই কান্নায় ভেঙ্গে পড়লো সে।

স্বপ্ন—তাও কি হয় সত্যি ?

সাংহাইতে এক নৈশভোজে এয়ার মার্শাল স্যার ভিকটর গডাডকে দেখে হঠাৎ চম্‌কে উঠলেন এক নেভি অফিসার, "এ কী আপনি !"

নৌ অফিসারকে এইভাবে চমকে উঠতে দেখে গডাডও কম আশ্চর্য হননি।

কিছু বলবার আগে নেভি অফিসারটি অত্যন্ত সংকোচে আমতা আমতা করে কোন রকমে বললেন—

"না, মানে, আমার এই অসৌজন্য প্রশ্নে আপনি কিছু মনে করবেন না স্যার। আমায় ক্ষমা করবেন। আমি অত্যন্ত দুঃখিত। না, মানে আমি অত্যন্ত আনন্দিত···আপনাকে সশরীরে এই পার্টিতে যে দেখতে পাচ্ছি, এ আমার পরম সৌভাগ্য। কী আশ্চর্য !" ···এয়ার মার্শাল গডাড নেভি অফিসারের ডান হাতটি নিজের হাতে টেনে নিয়ে অভয় দিয়ে বললেন—

"কি ব্যাপার বলুন তো। আপনি এমন করছেন কেন ? অস্বাভাবিক কিছু হয়েছে বলে মনে হচ্ছে !" নেভি অফিসারটি লজ্জায় যেন মাটির সাথে মিশে গেলেন, কোন উত্তর দিতে পারলেন না।

গডাড তখন তাঁর বাঁ হাতটি নেভি অফিসারের পিঠে রেখে বললেন, "নির্ভয়ে বলুন, কোন সংকোচ করবেন না। কি হয়েছে ?"

অত্যন্ত নম্র হয়ে নেভি অফিসারটি তখন নিবেদন করলেন, "স্যার, ভূত দেখার মত আপনাকে দেখে আমি চমকে উঠেছিলাম। আমায় মাফ করবেন। গত রাতে আমি একটা বিশ্রী স্বপ্ন দেখেছিলাম।"

গডাড বললেন, "স্বপ্ন? কি রকম?"

নেভি অফিসারটি মুখ নীচু করে বললেন—"স্বপ্নে দেখলাম প্লেন ক্র্যাশে আপনি মারা গেলেন। এরকম বাস্তবের চেয়ে স্পষ্ট স্বপ্ন জীবনে আমি কখনো দেখিনি!"

স্যার গডাড মুচ্‌কি হেসে নেভি অফিসারটির পিঠ চাপড়ে বললেন "এরই জন্যে এই এত কাণ্ড! এসবও আপনি বিশ্বাস করেন? সমুদ্রে যুদ্ধজাহাজ আপনি কি করে চালান?" তারপর হালকা সুরের জের টেনে আবার বললেন, "তা, স্বপ্নটা কি রকম দেখলেন একটু বলুন না! কোথায় কি ভাবে ক্র্যাশটা হোলো শোনাই যাক না?"

নেভি অফিসার লজ্জিত হয়ে বললেন, "না না, স্বপ্নটপ্ন আমি বিশ্বাস করি না। কিন্তু এরকম অদ্ভূত আশ্চর্য স্বপ্ন দেখে···চোখের সামনে ওই ভয়াবহ বীভৎস দৃশ্যটা যেন ভাসছে—আমি স্যার, আপনাকে দেখে চমকে উঠেছিলাম, পরে কি খুশীই যে হয়েছি বলার নয়। স্বপ্নটা সংক্ষেপে বলি। সন্ধ্যার পর সমুদ্রের ধারে পাহাড়ী জায়গায় আপনার প্লেন পাহাড়ের ওপরে মেঘের মধ্যে দিয়ে উড়ে যাচ্ছিল। ঝির-ঝির করে বরফ পড়ছিল। প্রতিকূল আবহাওয়ায় প্লেনটা কিছুতেই যেন পথের হদিশ করতে পারছিল না। তারপর—ওঃ, সে কী সাংঘাতিক ক্র্যাশ! আমি সমস্ত কিছু স্বচক্ষে দেখেছি। কিন্তু না, ওটা তো স্বপ্ন—আপনি তো এই দিব্যি বেঁচে আছেন স্যার।"

গডাড তখনও হাসছেন। হাসতে হাসতেই বললেন, "ভারি মজার ব্যাপার তো! তা প্লেনখানা কি চার ইঞ্জিনের না ছুই ইঞ্জিনের?"

নেভি অফিসারটি বললেন, 'সাধারণ একখানা প্লেন—ছু' ইঞ্জিনের ডাকোটা বলেই মনে হল আমার।"

স্যার গডাড যেন একটু চমকে উঠলেন। পরের দিন তাঁকে তো 'ডাকোটা' প্লেনেই পাড়ি দিতে হবে, সাংহাই থেকে টোকিও। একটু যেন কৌতূহলী হয়ে তিনি এবার প্রশ্ন করলেন, "আচ্ছা, আপনার স্বপ্নে আপনি কী দেখেছিলেন কাদের সঙ্গে আমি এই প্লেনে যাচ্ছিলাম?"

"হ্যাঁ, স্যার"—নেভি অফিসারটি ধীরে ধীরে বলে চললেন, "পাইলট ছিলেন আর. এ. এফ.-এর / আর আপনার সঙ্গে ছিলেন তিনজন বেসামরিক প্যাসেঞ্জার—ছুজন পুরুষ আর একজন মহিলা। সব্বাই ইংরেজ।"

এই কথা শুনে স্যার গডাড যেন অনেকটা আশ্বস্ত হয়ে গেলেন। হঠাৎ মনটা একটু যেন নাড়া খেয়ে গিয়েছিল, শেষের কথাগুলো শুনে ঠিক হয়ে গেল। তাঁর প্লেনে বেসামরিক প্যাসেঞ্জার থাকবার কোন প্রশ্নই ওঠে না। এরপর ছুজনে সৌজন্যমূলক ছু-চারটে কথা বলার পর, নেভি অফিসারটি বিদায় নিলেন।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ তখন শেষ হয়েছে।

এয়ার মার্শাল স্যার ভিকটর গডাড প্রশান্ত মহাসাগরে রয়াল

নিউজিল্যাণ্ড এয়ার ফোর্সের কমাণ্ডে ছিলেন বছর দুয়েক। তারপর ছিলেন বর্মা ও মালয়েসিয়ায় ব্রিটিশ এয়ার ফোর্সের চার্জে! বৈমানিক হিসাবে তিনি বিখ্যাত।

যুদ্ধ শেষে তিনি যাবেন স্বদেশে। সাংহাই থেকে টোকিও, সেখান থেকে নিজের দেশ নিউজিল্যাণ্ডে। সাংহাই থেকে টোকিও যাবার জন্য লর্ড মাউণ্টব্যাটেন তাঁর ব্যক্তিগত ব্যবহারের প্লেনখানাকে সৌজন্য দেখানোর জন্য এয়ার মার্শাল স্যার ভিকটর গডাডকে দিয়েছেন! প্লেনখানার নাম 'সিসটার অ্যান'। দু ইঞ্জিনের নির্ভর-যোগ্য নামকরা 'ডাকোটা' প্লেন। চালাবেন দক্ষ আর. এ. এফ পাইলট ক্যাপ্টেন ক্যাম্পবেল।

স্যার গডাডের নৈশ ভোজের নিমন্ত্রণ ছিল সাংহাইতে ব্রিটিশ কনসাল জেনারেল জর্জ অগডেনের বাড়িতে।

বিখ্যাত কাগজ 'ডেলি টেলিগ্রাফ'-এর সাংবাদিক সেমুর বেরী হন্তদন্ত হয়ে গডাডের কাছে এসে হাজির। হাঁপাতে হাঁপাতে বেরী বললেন, "বড্ড জরুরী কাজ স্যার। যতশীঘ্র সম্ভব আমার টোকিওতে যেতেই হবে। আপনার প্লেনে কাল সকালে আমায় একটু নিয়ে যাবেন দয়া করে? পাইলটের সঙ্গে দেখা করেছিলাম। তিনি বললেন, আপনি যদি অমত না করেন তাঁর কোনো আপত্তি নেই।"

স্যার গডাড কি যেন একটু চিন্তা করলেন। তারপর বললেন, "না, না, আমার কেন আপত্তি থাকবে? যথেষ্ট জায়গা আছে। চলে আসুন। আমি কিন্তু কাল রওনা হচ্ছি ঠিক সকাল সাড়ে ছটায়।"

অশেষ ধন্যবাদ দিয়ে সাংবাদিক বেরী বিদায় নিলেন।

ডিনার টেবিলে জর্জ অগডেন স্যার গডাডের সঙ্গে গল্প করছিলেন। হঠাৎ একটি বেয়ারা রূপোর ট্রেতে একখানি টেলিগ্রাম নিয়ে এসে হাজির। টেলিগ্রামটি অগডেনের। এসেছে লণ্ডন থেকে। অগডেন টেলিগ্রামখানা খুলে ভুরু কুচকে পড়লেন। তারপর স্যার গডাডকে টেলিগ্রামখানা দেখালেন। বললেন, "দেখুন তো কী ঝামেলা!"

গডাড টেলিগ্রামটি ততক্ষণে পড়ে ফেলেছেন। টেলিগ্রামে বলা হয়েছে, অগডেন যেন যতশীঘ্র সম্ভব টোকিওতে একটি মিটিংয়ে যান।

অগডেন বললেন, "আচ্ছা, আপনি তো কাল সকালে টোকিও রওনা হচ্ছেন। আপনার প্লেনে আমাকে নিয়ে যেতে পারেন না?"

স্যার গডাড অগডেনকে না বলেন কি করে? রাজি হতেই হল। মনে মনে ভাবলেন, অগডেনকে নিয়ে তাহলে তাঁর প্লেনে দুজন বেসামরিক প্যাসেঞ্জার যাচ্ছে। ঠিক আছে—তিনজন তো নয়, আর মহিলা প্যাসেঞ্জারের প্রশ্নই ওঠে না। কিন্তু, আবার ভাবলেন, দুজন প্যাসেঞ্জারই তো ইংরেজ! তাহলে?...

খাওয়া-দাওয়া শেষ হয়ে এলো।

অগডেনের নামে আবার একখানা টেলিগ্রাম এসে হাজির! এ টেলিগ্রামটা এসেছে টোকিও থেকে।

টেলিগ্রামে লেখা—'এখানে কোনো স্টেনো টাইপিস্ট নেই। ওখান থেকে একজনকে আনতে পারলে কৃতজ্ঞ থাকবো।' টেলিগ্রাম-খানা গডাডকে দেখিয়ে অগডেন খুবই বিনীতভাবে বললেন, "আবার কি ঝামেলা দেখুন তো। আপনি দয়া করে আর একটা সিট দিলে

বড় উপকার হবে। একটা স্টেনো টাইপিস্টকে তাহলে এখান থেকেই নিয়ে যাই আমি।”

গডাডের কোন আপত্তি থাকার কথা নয়। প্লেন তো খালিই যাচ্ছে। কিন্তু গডাড আশ্চর্য হয়ে ভাবলেন, এটা হচ্ছে কী! স্বপ্নে দেখা সব কিছু সাজানো দেখছি।

গডাড কায়দা করে বললেন,. “হ্যাঁ, হ্যাঁ, চলে আসুক আপনার স্টেনো টাইপিস্টও। প্লেন তো খালিই যাচ্ছে। কিন্তু পুরুষ হলেই ভাল হয়। তাই না?” বলে হাসতে লাগলেন।

অগডেনও হেসে ফেললেন। বললেন, “স্টেনো টাইপিস্ট মেয়েই হবে নিশ্চয়ই। পুরুষ হোক্ মেয়ে হোক্, ওতে আর কি এসে যাবে।”

গডাড হালকা ভাবে বললেন, “তা যা বলেছেন। কিন্তু তবু দেখুন চেষ্টা করে। পুরুষ না পেলে মেয়েই নিন। উপায় কী।”

মনে মনে স্যার গডাড কিন্তু বেশ বিচলিত হয়ে পড়লেন। তাঁর সঙ্গে যাচ্ছে তা হলো শেষ পর্যন্ত তিনজন বেসামরিক প্যাসেঞ্জারই। তুজন পুরুষ, একজন সম্ভবত মহিলা। কিন্তু এসব কুসংস্কারকে তিনি মনে আমল দিতে চান না। ঝেড়ে ফেললেন সব কিছু তুর্ভাবনা। পার্টি থেকে ফিরে ঘুমিয়ে পড়লেন তিনি। ঘুম ভাঙতে তাঁর একটু দেরি হল সে রাতে। স্বপ্নের কথাগুলো তাঁর মনকে বারে বারে নাড়া দিতে লাগলো।

পরের দিন শীতের সকালটা কেমন যেন থমথমে। এয়ারপোর্টে স্টেনো টাইপিস্ট একটি সুন্দরী মেয়েকে দেখে স্যার গডাডের মনটা কেমন যেন বিগড়ে গেলো। অগডেনের কাছে শুনলেন, মেয়েটির নাম

ডোরিটা। স্বপ্নের কথাটা তাঁর আবার মনে পড়ে গেলো। ডাকোটা প্লেন,—তিনজন বেসামরিক প্যাসেঞ্জার, তার মধ্যে আবার একজন মহিলা—সকলেই ইংরেজ। চলেছিলেন, সাংহাই থেকে টোকিও।

গডাড স্বপ্নের কথাটাই ভাবছিলেন।

চমকে উঠলেন পাইলট ক্যাম্পবেলের কথায়, "গুড মর্নিং স্যার"।

—"গুড মর্নিং। আবহাওয়ার পূর্বাভাস ভালো তো?" গডাড স্বাভাবিক হবার চেষ্টা করলেন তাঁর কথা বলার সুরে ও কায়দায়।

—"তেমন খারাপ কিছু না স্যার। টোকিও থেকে শ খানেক মাইল আগে বেশ কিছু মেঘের সমারোহ আছে। মনে হয় ঘণ্টা ছয়েকে পোঁছে যাবো আমরা।"

গডাড ক্যাপ্টেন ক্যাম্পবেলের করমর্দন করে বললেন, "গুড।"

একে একে সবাই গিয়ে প্লেনে বসলেন। সিটবেল্ট বাঁধা হল। প্লেনখানার ইঞ্জিন ছুটো স্টার্ট করা হল। এরপর সাংহাই ছেড়ে প্লেনখানা আকাশে উড়লো টোকিও অভিমুখে।

স্যার গডাড আরাম করে পা ছড়িয়ে বসলেন। গত কয়েকদিন হরেক রকম পার্টিতে গিয়ে ক্লান্ত তিনি। ভাবলেন, একটু চোখ বুজিয়ে নেবেন। কিন্তু স্বপ্নের কথাটা কিছুতেই তিনি মন থেকে একেবারে ঝেড়ে ফেলতে পারছেন না। নিজেকে বোঝালেন স্বপ্নের এই ক্র্যাশটা তো হবার কথা বিকেলে তার, তাও সেটা ওই নেভি অফিসার বলেছিল, বরফ-ঝড় হবার কথা। লাঞ্চের সময়ই তো তাঁরা টোকিও পোঁছে যাচ্ছেন। আবহাওয়ার পূর্বাভাসও তো মোটামুটি ভালই। …এই সব কথা ভাবতে ভাবতেই ঘুমিয়ে পড়লেন তিনি।

প্লেনখানা দিব্যি উড়ে চলেছে। দোলানি নেই, ঝাঁকানি নেই। প্যাসেঞ্জাররা সবাই আরামে ঘুমোচ্ছে।

হঠাৎ গডাডের ঘুম ভেঙে গেলো। প্লেনখানা দারুণ দুলছে। জানলার বাইরে দিয়ে তাকিয়ে দেখেন, ঘন কুয়াশার মধ্যে দিয়ে প্লেনখানা তখন উড়ে চলেছে। বিশেষ কিছুই দেখা যাচ্ছে না। মাটি বা সমুদ্র তো নয়ই। ঘন ঘন নিঃশ্বাস পড়ছে তাঁর। তার মানে বেশ বেশি উঁচু দিয়েই তাদের প্লেনখানা এগিয়ে চলেছে। ডাকোটা প্লেনখানা প্রেশারাইজড্ নয় তাই বেশি উঁচুতে উঠে গেলে শ্বাসকষ্ট কিছুটা হবারই কথা। হ্যাঁ, ঠিক তাই। গডাড দেখলেন প্লেনের ডানায় কিছু কিছু বরফ জমছে।

একটু পরেই পাইলট ক্যাম্পবেল কক্‌পিট থেকে কেবিনে এসে হাজির। বললেন, "সতেরো হাজার ফিট উঁচু দিয়ে ফ্লাই করতে হচ্ছে স্যার। আকাশ পথে বিরাট বিরাট সব মেঘের পাহাড় পড়েছে। ওই মেঘগুলোর ওপরে প্লেনখানাকে না রাখলে বড্ড বেশি বরফ জম্‌ছে প্লেনের ডানায়।"

গডাড ভাবলেন, সাধারণত ডাকোটা ওড়ে সাত থেকে দশ হাজার ফিট উঁচু দিয়ে। এ যে একেবারে সতেরো হাজার! নিঃশ্বাসের কষ্ট তো হবেই।

গডাড কোন মন্তব্য করলেন না।

অগডেনের দিকে তাকিয়ে দেখেন, হাঁপানী রুগীর মত হাঁপাচ্ছেন তিনি। বেরী ও ডোরিটা ঘুমোচ্ছে তাই রক্ষে। তবুও নিঃশ্বাস পড়ছে তাদের ঘনঘন। গডাড নিজের সিটে বসেই তাদের শ্বাস-

প্রশ্বাসের শব্দ শুনতে পেলেন। একটু পরেই ক্যাম্পবেল আবার কেবিনে এসে বললেন, "সামনেই আরও উঁচু মেঘের পাহাড়। আমাদের স্যার, মেঘের মধ্যে দিয়ে কিছুক্ষণ যেতেই হবে। এখনই আঠারো হাজারে উঠেছি—আর ওপরে ওঠা ঠিক হবে না।

গডাড শান্ত ভাবে সায় জানালেন।

এরপর প্লেনখানা সাংঘাতিকভাবে দুলতে দুলতে এগিয়ে চললো। কিন্তু এর চেয়ে মুশকিল হল এই যে প্লেনের ডানায় ক্রমাগত বরফ জমতে শুরু করলো আর সেগুলো মাঝে মাঝে ভেঙে ছিটকে প্লেনের গায়ে পড়তে লাগলো।

গডাড ঘড়ি দেখলেন। বেলা তখন ১২টা ২০ মিনিট।

টোকিওর সময় এটা হবে ২টা ২০ মিনিট।

নিঃশ্বাসের কষ্ট আরও বেড়েছে। কানের ভেতরটা কেমন যেন ভোঁ-ভোঁ করছে। অক্সিজেনের অভাবে অগডেন আর ডোরিটার অজ্ঞান হয়ে যাবার অবস্থা। বেরীর অবস্থাও অনুরূপ। সকলেই এখন জেগে। নিঃশ্বাসের কষ্টে ঘুম গেছে ছুটে।

গডাড ককপিটে গিয়ে পাইলটকে বললেন, "ডাকোটার মতো প্লেনের পক্ষে আমরা বড্ড বেশি উঁচুতে উঠে এসেছি। তাই না? আমার মনে হয় কিছুটা নেমে যাওয়াই ভাল। যাই হোক, আপনি যেমন ভাল বুঝবেন তেমন করুন।"

ক্যাম্পবেলকে কেমন যেন ফ্যাকাশে দেখাচ্ছে। উত্তেজনায় না ভয়ে বলা শক্ত। উৎসাহ দিয়ে তাই বোধহয় গডাড আবার বললেন, "ঘাবড়াবেন না, ঠিক হয়ে যাবে সব।"

ক্যাম্পবেল বললেন, "দেখি, নীচের দিকে নামবারই চেষ্টা করে দেখি।'

প্লেনখানা নীচের দিকে নামতে লাগলো। ঘন মেঘ আর কুয়াশার মধ্যে দিয়ে দোলনার মতো দুলতে লাগলো প্লেনখানা। ওঃ সে কি ঝাঁকানি।

গডাড বুঝতে পারলেন, বিপদ আসন্ন। যে কোন মুহূর্তে যা হোক কিছু একটা ঘটে যেতে পারে। মেঘের রাজ্য থেকে প্লেনখানা শেষপর্যন্ত বেরিয়ে এলো পরিষ্কার আকাশে। কিন্তু এ কী! গডাড নীচের দিকে তাকিয়ে দেখেন—সমুদ্রের ঢেউগুলো সব দেখা যাচ্ছে আর বরফ-ঝড়ের মধ্যে দিয়ে প্লেনখানা উড়ে চলেছে। ঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখেন দুপুর তিনটে তিরিশ। বিকেল তো হয়ে এলো! তাহলে? স্বপ্নের কথাগুলো গডাডকে এইবার যেন চেপে ধরলো। সন্ধ্যা হয়ে আসছে—পাঁচটায় সন্ধ্যে হয়ে যাবে···সমুদ্রের ধারে···বরফ ঝড়···তিনজন বেসামরিক প্যাসেঞ্জার, তার মধ্যে একজন মহিলা··· সবাই ইংরেজ···এসবই তো স্বপ্নেতেই ছিল।

প্লেনখানা সমুদ্রের ধার ধরে এগিয়ে চলেছে। তীরের কাছেই বরফ ঢাকা একটা গ্রাম দেখা গেল। এখানে-ওখানে ছোট-ছোট পাহাড়। ঘড়িতে চারটে পাঁচ হয়ে গেল কিন্তু কোথায় টোকিও?

গডাড নিজের সিট্-বেল্ট খুলে আবার ককপিটে গিয়ে হাজির হলেন। ন্যাভিগেটরের ম্যাপ দেখলেন। টোকিও তখনও শ'খানেক

মাইল দূরে। ক্যাম্পবেলকে বললেন, "পাঁচটা তো প্রায় বাজে, পেট্রোলের অবস্থা নিশ্চয়ই ভাল নয়?'

পাইলট তখন ওই শীতের দিনেও উত্তেজনায় ঘামছেন। বললেন, "স্যার, ক্র্যাশ ল্যাণ্ড করা ছাড়া আর বোধহয় আমাদের গতি নেই। প্যারাসুট নিয়ে লাফিয়ে পড়া সম্ভব হবে না। নীচের মাটি কি জল নজরে আসছে না ঠিক। তাছাড়া বাতাসের বেগও খুব বেশী—প্যারাসুট ভাসতে ভাসতে কোথায় নিয়ে গিয়ে ফেলবে, তারও নেই কোন ঠিকানা।"

স্বপ্নের কথা গডাডকে তখন পেয়ে বসেছে। ক্যাম্পবেলের কথাগুলো বোধহয় তিনি শুনতেই পেলেন না। চমকে উঠে বললেন, "কী বলছেন?"

ক্যাম্পবেল পাল্টা প্রশ্ন করলেন, "ক্র্যাশ ল্যাণ্ড করার সময় প্লেনের চাকাগুলো তুলে রাখবো না নামিয়ে দেবো? আপনি কি বলেন স্যার?"

গডাড মুহূর্তের জন্যে কি যেন চিন্তা করলেন। তারপরই বললেন, "আমার মনে হয়, চাকা নামিয়ে এখানে নামতে গেলে প্লেনখানা উল্টে যাবেই। আবার চাকা তুলে রেখে পেটের ওপর নামতে গেলে পাথরের নুড়ির ওপর স্লিপ করে প্লেনখানা বহুদূরে চলে গিয়ে আশেপাশের পাহাড়ে ধাক্কা মারবেই। বরং চেষ্টা করুন যাতে প্লেনখানা প্রথমে চাকার ওপর নামতে পারে। মাটি ছোঁবার একটু পরেই চাকা দুখানা তুলে নেবেন। খুব তৎপর হতে হবে কিন্তু। চাকার ওপর নামলেই প্লেনের গতি অনেকটা কমে যাবে। কিন্তু

উল্টে যাবার আগেই চাকা দুটো তুলে নিয়ে প্লেনের পেটের ওপর ঘষটাতে থাকবেন।”

ক্যাম্পবেল প্লেনের কন্ট্রোলগুলো নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়লেন। ছোট্ট উত্তর দিলেন, “ঠিক আছে স্যার।”

গডাড কেবিনে চলে এসে নিজের সিটে বসে বেল্ট বেঁধে নিলেন। মনে মনে তৈরীও হয়ে নিলেন তিনি। স্বপ্নটা তাহলে সত্যি হতে চলেছে। মুহূর্ত গুনতে লাগলেন তিনি। বুঝতে পারলেন, ডাকোটার চাকাদুটো প্লেনের পেটের মধ্যে থেকে নেমে গেলো। জানালা দিয়ে দেখলেন ডানার ফ্ল্যাপগুলোও নেমে গেলো। প্লেনখানা ল্যাণ্ড করবার চেষ্টা করছে। মুখ নীচু করে ডাকোটা প্লেনখানা একটি ছোট্ট পাহাড়ের পাশ দিয়ে কাৎ হয়ে নীচের দিকে নামছে। ইঞ্জিন দুটোর শব্দ কমে গিয়েছে। গডাড দেখলেন, অগডেনের মুখে কেমন যেন বেখাপ্পা বেমানান হাসি—সমস্ত স্নায়ু তাঁর অকেজো হয়ে গিয়েছে। ডোরিটা চোখ বুজে মাথা নীচু করে বসে আছে—সম্ভবত তার ইষ্ট-দেবতার নাম স্মরণ করছে। বেরী সামনের দিকে অর্থহীন দৃষ্টি নিয়ে তাকিয়ে আছে। কি ভাবতে হবে তাই বোধহয় ভুলে গিয়েছেন তিনি।

প্লেনের বাঁ দিকের জানালা দিয়ে গডাড দেখলেন, পাহাড়ের দেওয়াল। এই দেওয়ালের ধার দিয়ে ডান দিকে কাৎ হয়ে প্লেনখানা নীচের দিকে নামছে,...একবার যেন প্লেনখানা সোজামত হল,... তারপরই পাথরের নুড়ির মধ্যে কেটে যেন বসে যাচ্ছে প্লেনের চাকা দুটো। প্লেনের গতি বেশ কিছুটা হঠাৎ যেন কমে গেল। ঠিক সেই

মুহূর্তেই পাইলট প্লেনের চাকাদুটো আবার মাটি থেকে তুলে নিয়েছেন। প্লেনখানা 'বুম—ক্র্যানচ—ক্র্যানচ' করে ঘষটাতে লাগলো পাথরের নুড়ি ছড়ানো-ছিটানো সমুদ্রের ধারে। প্লেনখানা শেষপর্যন্ত ক্র্যাশ ল্যাণ্ডই করেছে। গডাড কিছু ভাববার আগেই তাঁর ঘাড়ের ওপর সিটসুদ্ধ অগডেন এসে পড়লেন। গডাড ভাবলেন, তাঁর ঘাড়টা বোধহয় ভেঙেই গেল। কিন্তু না। প্লেনখানা ততক্ষণে কিছুদূর ঘষটাবার পর থেমে গিয়েছে। প্লেনখানা ভাঙেওনি। প্লেনে আগুনও লাগেনি। আশ্চর্য!

সবাই নিজের নিজের সিট-বেল্টগুলো তাড়াতাড়ি খুলে ফেললেন। পাইলট ক্যাম্পবেল প্যাসেঞ্জার কেবিনে ছুটে এলেন।

—"স্যার আপনি ঠিক আছেন তো?"

গডাড পাইলটের হাত ধরে তাঁকে অভিনন্দন জানালেন! তারপর হাসতে হাসতে বললেন, "এই অগডেনই চেষ্টা করেছিলেন সিট সুদ্ধু আমার ঘাড়ের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে আমার ঘাড় মটকাতে। কিন্তু তা তিনি শেষপর্যন্ত পারলেন না। নিজেই বোধহয় কিছুটা আহত হয়েছেন। আর অন্য দুজন বোধহয় নিজেরাই এখনও জানে না যে তারা বেঁচে আছে। ভয়ে আধমরা হয়ে রয়েছেন। ওদের ধরে নামাতে হবে।"

একে একে সবাই প্লেন থেকে বাইরে বেরিয়ে এলেন। গডাড এবং ক্যাম্পবেলই অন্য তিনজন বেসামরিক প্যাসেঞ্জারদের সাহায্য করলেন এ ব্যাপারে।

গডাডই কেবল ভাবতে লাগলেন, স্বপ্নটা তাহলে আশ্চর্যরকম

ভাবে অক্ষরে অক্ষরে সত্যি হয়ে গেল। একটু খুঁত খালি থেকে গেল। মৃত্যু তাঁর হল না। আবার ভাবলেন, নেভি অফিসার ক্র্যাশটা দেখেছিলেন বাইরে থেকে। পারিপার্শ্বিক পরিবেশ সব কিছুই ঠিকই দেখেছিলেন। এ ধরনের ক্র্যাশে যা অবশ্যম্ভাবী তাই তিনি মেনে নিয়েছিলেন। প্লেনের ভেতরটা তো আর দেখেননি তিনি। তাই বোধহয় তাঁর অলৌকিক রক্ষা পাওয়াটুকু তিনি বোধহয় দেখতে পাননি। যাই হোক, প্লেনে চড়ার আগে কখনও কোন প্যাসেঞ্জার যেন কোন ক্র্যাশ করার স্বপ্নের খবরদারী না শোনেন! আকাশ অভিযানের আনন্দ তাতে সব কিছু নষ্ট হয়ে যায়।

নকল চাঁদ

১৯৫৭ খৃষ্টাব্দের শেষের দিকে আকাশে আমরা আরও একটি চাঁদ দেখতে পাই! এই নকল চাঁদ হল আকাশ-বিজ্ঞানীদের তৈরী। আসল চাঁদের মত পৃথিবীকে প্রদক্ষিণ করে বেড়াচ্ছে এই নকল চাঁদটিও। এইজন্যই একে 'চাঁদ' বলা হ'ল। পৃথিবীকে ঘুরে বেড়ানোটাই সাদৃশ্য —তা ছাড়া আর কোন মিল নেই এই দুই চাঁদে। না রূপে, না গুণে। আমাদের তৈরী নকল চাঁদকে দেখতে হলে টেলিস্‌কোপের সাহায্য নিতে হবে। এই আজগুবি কাণ্ড আমরা কেন করতে গেলাম তাই বলি।

শুনে থাকবে বোধহয়, গত মহাযুদ্ধের সময় জার্মানি V2 রকেট বম্ব ব্যবহার করেছিল। V2 রকেট আকাশে উঠত প্রায় ১১৫ মাইল উঁচুতে! আকাশের অনেক ওপরে উঠে গেলেও বায়ুমণ্ডল একেবারে নিশ্চিহ্ন হয় না। বিশ মাইল ওপরে, বাতাস পাতলা হয়ে গিয়ে আমাদের পৃথিবীর বাতাসের চেয়ে প্রায় একশো ভাগের এক ভাগ পাতলা হয়। তবুও সাংঘাতিক গতির কোন আকাশযানের ওপর এর প্রভাব মারাত্মক। কিন্তু ১২০ মাইল উঁচুতে বাতাস পাতলা হয়ে গিয়ে প্রায় না থাকারই সামিল হয়ে দাঁড়ায়। এখানের আকাশকে আমরা প্রায় শূন্য আকাশই ভাবতে পারি। যুদ্ধের পর V2 রকেট

নিয়ে বহু গবেষণা হয়ে গিয়েছে। ওপরের আকাশকে জানবার জন্য বহুবার V2 রকেট New Mexico থেকে আকাশের ওপর ছোঁড়া হয়েছে। রকেটে বোমা না রেখে, রাখা হয়েছে বহু বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি। V2 রকেট থেকে বেতারে পাঠানো খবর আমরা পৃথিবীতে বসে সংগ্রহ করেছি। যত উঁচুতে উঠতে থাকে, বাতাসের তাপ, চাপ, ঘনত্ব ইত্যাদি কি ভাবে বদলাতে থাকে, ওপর আকাশে সূর্যরশ্মির রকমফের, এই ধরনের মূল্যবান তথ্য সংগ্রহ করাই এইসব রকেটের কাজ। যেমনি তেড়ে পৃথিবী ছেড়ে V2 রকেট ওপরে ওঠে, ১১৫ মাইল ওপরে ওঠার পর, পৃথিবীতে সেটা ফিরে আসেও তেমনি মারাত্মক গতিতে— ঘণ্টায় প্রায় ২০০০ মাইল বেগে! এই মারাত্মক গতিতে crash করার পর তা থেকে যন্ত্রপাতি উদ্ধার করা একরকম অসম্ভব। Crash হবার আগে তাই বিশেষ কায়দায় প্যারাস্যুটের সাহায্যে এইসব যন্ত্রপাতি নামিয়ে নেওয়ার ব্যবস্থা করতে হয়েছে।

V2 রকেটের কায়দায় আমেরিকানরা পরে তৈরী করেছেন ৫-টন্ Martin-Viking রকেট। ১৩৫ মাইল উঁচু পর্যন্ত এই রকেট উঠতে পেরেছিল। V2 এবং Viking এরা সব এক-পাল্লার রকেট। পরে দু-পাল্লার রকেট তৈরী হয়েছে। V2 রকেট টেনে তুলে নিয়ে গিয়েছে W. A. C. corporal রকেটকে। V2-র যাত্রা শেষ হলে, W. A. C. corporal রকেটের যাত্রা হয়েছে সুরু। এই কায়দায় ২৪২ মাইল পর্যন্ত রকেট ওপরে উঠেছে।

গ্রহ-উপগ্রহে যাবার জন্য আমাদের দু'ধরনের রকেট একই সঙ্গে উন্নতির পথে এগিয়ে চলেছিল। প্রথমটা হ'ল, যন্ত্রপাতি নিয়ে

আকাশে রকেট উঠবে নানা তথ্য যোগাড় করার জন্য। দ্বিতীয়টা হ'ল, আরোহী নিয়ে রকেট উঠবে আকাশ পাড়ি দেবার জন্য। প্রথমটি দ্বিতীয়টির সহায়তা করবে, অভিযান সহজ, আরামদায়ক এবং নিরাপদ করবে। প্রথমটি ভিত, দ্বিতীয়টি ইমারত।

এই প্রথম উদ্দেশ্যেই নকল চাঁদের সৃষ্টি।···

আকাশে চাঁদ অমনি করে ঝুলে রয়েছে কি করে? পৃথিবীর ওপরে পড়ে যায় না কেন? প্রায় ৩০০ বছর আগে বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক নিউটন এর উত্তর দিয়ে গেছেন। আমরা যে কারণে পৃথিবীর গায়ে লেগে রয়েছি, ঠিক সেই কারণে চাঁদও আকাশের ওপর ঝুলে রয়েছে। কারণটা হ'ল মাধ্যাকর্ষণ।

পৃথিবী থেকে যত দূরে যাব, মাধ্যাকর্ষণ-শক্তি তত কমতে থাকবে। অনেকের ধারণা হতে পারে যে হাজার হাজার মাইল দূরে চলে গেলে এই মাধ্যাকর্ষণ-শক্তি নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে। তা কিন্তু হয় না। মাধ্যাকর্ষণ-শক্তি কমে যায় বটে, কিন্তু একেবারে মুছে যায় না। পৃথিবী থেকে চাঁদের দূরত্ব ২২১,০০০ থেকে ২৫২,০০০ মাইল। তবুও চাঁদের ওপর পৃথিবীর টান সাংঘাতিক। চাঁদের গতি যদি না থাকত, তা'হলে সেটা পৃথিবীর ওপর হুমড়ি খেয়ে এসে পড়ত। ভাগ্যিস তা পড়ে না। পড়লে হয়েছিল আর কি! সূতোয় বাঁধা ঢিলকে আমাদের মাথার চারদিকে ঘোরালে যেমন হয়, চাঁদেরও হয়েছে সেই দশা। সূতো দিয়ে ঢিলটাকে যেমন আমরা নিজেদের দিকে টানতে থাকি, পৃথিবীও তেমনি অদৃশ্য মাধ্যাকর্ষণ-শক্তি দিয়ে চাঁদকে টেনে রেখেছে। ঢিলটির যেমন প্রথম একটি গতি দিয়ে দেওয়া হয়, যার জন্য সেটা চক্রাকারে ঘুরতে

থাকে, চাঁদেরও তেমনি একটি গতি আছে প্রথম থেকেই। গতি না থাকলে ঢিলটাকে আমরা যেমন নিজেদের কাছে টেনে আনতে পারি, চাঁদেরও গতি বন্ধ হয়ে গেলে সেটা পৃথিবীর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়বে। সূতো ছিঁড়ে গিয়ে ঢিলটির ওপর আমাদের হাতের টান যখন চলে যায়, তখন ঢিলটা আমাদের কাছ থেকে ছিটকে নিজের গতিতে দূরে চলে যায়। মাধ্যাকর্ষণ চলে গেলে চাঁদেরও হবে সেই দশা। ছিটকে কোথায় গিয়ে যে সেটা পড়বে তার ঠিক নেই।

পৃথিবীকে কেন্দ্র করে চাঁদ চক্রাকারে ঘুরছে ঘণ্টায় প্রায় ২০০০ মাইলেরও ওপর। বর্তমানে পৃথিবী থেকে যে দূরত্ব রেখে চাঁদ ঘুরছে তার সামান্য হেরফের হলে ক্ষতি নেই। দূরত্বের অদলবদল হলে গতিরও সামান্য রকমফের হয়। চাঁদের কক্ষ একেবারে চক্রাকার নয় বলে এই রকম হেরফের প্রায়ই হচ্ছে।

অন্য গ্রহ যেমন বৃহস্পতি, শনি এদের চাঁদের সংখ্যা একাধিক। বিভিন্ন দূরত্ব রেখে চাঁদগুলো দিব্যি খোশ মেজাজে নিজেদের কক্ষের ওপর গ্রহটিকে কেন্দ্র করে ঘুরে বেড়াচ্ছে। অতএব কয়েক শ' মাইল উঁচুতে আমাদের যদি একটি নকল চাঁদ থাকে তা'হলে প্রাকৃতিক নিয়মের কোন বিরুদ্ধাচরণ করা হচ্ছে না। মনে রাখতে হবে, এত কাছের চাঁদকে ঘুরতে হবে বাঁই-বাঁই করে, তা না হলেই পৃথিবী তাকে নিজের কোলে টেনে নেবে। তার কারণ, চাঁদ এত কাছে এসে গেলে, তার ওপর মাধ্যাকর্ষণ-শক্তিও অসম্ভব রকম বেড়ে যাবে। তাই আকাশে কয়েক শ' মাইল উঁচুতে নকল চাঁদ তৈরী করতে হলে, তার গতিও বাড়াতে হবে। ঘণ্টায় ১৮০০০ মাইল গতিতে এই নকল চাঁদ

যদি প্রায় ৩০০ মাইল দূর দিয়ে পৃথিবীকে প্রদক্ষিণ করে, তবে ঘণ্টা দেড়েক সময়ে সেটা পৃথিবীকে একবার প্রদক্ষিণ করে আসতে পারবে।

আকাশে যে নকল চাঁদের সৃষ্টি করা হয়েছে তার ব্যাস মোটে ২০ ইঞ্চি, ওজন ২২ পাউণ্ড! তবুও এই খুদে চাঁদকে আকাশে ছুঁড়তে হয়েছে তিন পাল্লার রকেট দিয়ে। রকেটটি লম্বায় ৭০ ফুট, ওজনে ১১ টন। প্রথম রকেটটি নকল চাঁদ এবং অন্য দুটি রকেটকে দু' মিনিটে প্রায় ৪০ মাইল ওপরে তুলে দিয়েছে। দ্বিতীয় রকেটটি তখন নকল চাঁদটিকে এবং তৃতীয় রকেটটিকে ওপরে ঠেলে তুলেছে প্রায় ২৫০ মাইল পর্যন্ত। বায়ুমণ্ডল পাতলা বলে দ্বিতীয় রকেটটির কাজ প্রথমটির তুলনায় অনেক সহজ। তৃতীয় ধাপে একটি রকেট-মোটর নকল চাঁদটিকে তার কক্ষপথে ঘণ্টায় প্রায় ১৮০০০ মাইল বেগে ঠেলে দিয়েছে। নকল চাঁদ পৃথিবীকে প্রদক্ষিণ করে ঘুরছে। এই নকল উপগ্রহটি দু' সপ্তাহ থেকে এক বছর পর্যন্ত আকাশে থাকতে পারে। পৃথিবী থেকে এর নিকটতম দূরত্ব প্রায় ২০০ মাইল। সব চেয়ে বেশী দূরে যখন চলে যাবে তখন এর দূরত্ব দাঁড়াবে প্রায় ১৫০০ মাইল। তার মানে, এর কক্ষপথ হল ক্রান্তিবৃত্তাকার (elliptical)। ক্রমে এর গতিবেগ অবশ্য কমতে থাকবে এবং পরে সেটি মাধ্যাকর্ষণের আধিক্যে পৃথিবীর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়বেই। পৃথিবীতে পড়বার আগে, বাতাসের বাধায় উল্কার মত এটা জ্বলে পুড়ে অনেক আগেই ছাই হয়ে যাবে।

এই নকল চাঁদ থেকে অতি মূল্যবান তথ্য সব বেতারে প্রচারিত হয়েছে। পৃথিবীতে বসে বৈজ্ঞানিকেরা তা সংগ্রহ করেছেন। নকল

চাঁদের কক্ষপথে বাতাস কত ঘন, তার তাপ কি রকম, সূর্যরশ্মির স্বভাব কেমন ইত্যাদি বহুকিছু বৈজ্ঞানিক তথ্য যন্ত্র সাহায্যে মাপা হয়ে আপনা-আপনি বেতারযন্ত্র দিয়ে প্রচারিত হয়েছে।

একটি নকল চাঁদে যথেষ্ট যন্ত্রপাতি পাঠানো সম্ভব নয়। আমেরিকান বৈজ্ঞানিকেরা তাই এমনই বহু নকল চাঁদ আকাশে সৃষ্টি করেছেন!

এই নকল চাঁদ কে খালি চোখে দেখা সম্ভব নয়। তবে বিভিন্ন সময়ে আকাশে তাদের অবস্থান বলে দেওয়া যাবে। বাইনাকুলার দিয়ে ভোরবেলায় এবং সন্ধ্যায় এদের উল্কার মত দেখা হয়তো সম্ভব হবে।

রাশিয়ানরাও এমনি নকল চাঁদ আকাশে সৃষ্টি করেছেন। আমরাও এমনই একটা নকল চাঁদ "আর্যভট্ট" আকাশে ছেড়ে দিয়েছি ১৭ই এপ্রিল ১৯৭৫ সালে। পরে ছেড়েছি "ভাস্কর" আর "রোহিনী।"

আমাদের পৃথিবীর আরও খবর এই নকল চাঁদ দিতে পারবে। পৃথিবীর আকৃতিটা ঠিক কি রকম, নকল চাঁদ পৃথিবীর চারদিকে ঘুরে ঠিক বলে দিতে পারছে। উত্তর এবং দক্ষিণ মেরুর কাছে কিছুটা চ্যাপ্‌টা কিনা (কমলালেবুর মত—যা আমরা ছোটবেলা থেকে ভূগোলে পড়ে আসছি) এবং হলেও কতখানি চ্যাপ্‌টা, সব তথ্য যোগাড় করতে পারছে এই নকল চাঁদ।

বৈজ্ঞানিকেরা লক্ষ্য করেছেন, যে Stratosphere-এর তলার দিকে বাতাস অত্যন্ত ঠাণ্ডা। এই স্তরের মাঝামাঝি আবার গরম। পরে যেখানে Stratosphere-এর শেষ এবং Ionosphere-এর সুরু

সেখানে আবার খুব ঠাণ্ডা। এর কারণ আজ পর্যন্ত কেউ সঠিক বলে দিতে পারেন নি। নকল চাঁদ আকাশে উঠে এ বিষয়ে আমাদের অনেক ওয়াকিবহাল করে দিয়েছে।

যে আকাশযানে আমরা ভবিষ্যতে গ্রহ-উপগ্রহে যাবার জল্পনা-কল্পনা করছি, সেই আকাশযানে আকাশপথে উল্কার সঙ্গে ধাক্কা লাগার সম্ভাবনা কতখানি? এই যে নকল চাঁদ আকাশে ঘুরে বেড়াবে, এর সঙ্গে উল্কাগুলোর ধাক্কা লাগে কি না, লাগলেও কি ধরনের ক্ষতি হতে পারে আকাশযানের, এইসব খবরও আমাদের কাছে মূল্যবান তথ্য।

চল যাই অন্য গ্রহে

পৃথিবীর দ্রষ্টব্য সব কিছু দেখা হয়ে গেছে আমাদের। বৈজ্ঞানিকদের অনুসন্ধিৎসার কিন্তু কখনও শেষ হয় না। এইবার, তাই, অন্য গ্রহ-উপগ্রহে গিয়ে দেখতে হবে, সেখানে কি আছে না আছে। এ ইচ্ছা সার্থক করতে গেলে ঝামেলা-ঝঞ্ঝাটের অন্ত নেই। তবুও আমরা যেতে চাই। সমস্যার শেষ নেই। তবুও মাথার ঘাম পায়ে ফেলছেন আমাদের এই পৃথিবীর বৈজ্ঞানিকেরা। অন্য গ্রহ-উপগ্রহে যদি আমাদের মত মানুষ থাকে, তাদেরও ইচ্ছা কি এমনি প্রবল হয়েছে? কে জানে!

ছোট ছেলে চাঁদ ধরতে চাইলে তাকে আমরা বেয়াড়া বায়নাদার বলি। কিন্তু এখন "বাবার মত বড়" হয়েও বৈজ্ঞানিকদের বায়নাক্কার শেষ নেই! মঙ্গলগ্রহে যেতে হলে কি করতে হবে, শুক্রগ্রহে যাবার সমস্যা কি, চাঁদের দেশে গেলে কি নটখটি, এ সব নিয়ে বর্তমানে রীতিমত গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক বস্ছে যখন তখন। বৈজ্ঞানিকেরা বলছেন —"অন্য গ্রহ-উপগ্রহে আমরা যাবোই, তবে সেটা সময় সাপেক্ষ।"

পৃথিবী থেকে অন্য গ্রহ-উপগ্রহের উদ্দেশে উড়ে যেতে হলে প্রথম বাধা দেবে আমাদের পৃথিবীর বাতাস। এক হাঁটু কাদার মধ্যে দিয়ে মোটর গাড়ি চালিয়ে নিয়ে যাওয়া এর কাছে নস্যি। পৃথিবীকে

মুড়ে কয়েক মাইল ব্যাপী বাতাস-সমুদ্র রয়েছে। পৃথিবী থেকে যে কোন গ্রহ-উপগ্রহে পৌঁছতে হলে এই বাতাস-সমুদ্র আমাদের ভেদ করতেই হবে। আর এই সব বিরাট দূরত্ব পাড়ি দেবার যদি সত্যই ইচ্ছা থাকে, তবে গতি আমাদের বাড়াতে হবে সাংঘাতিক রকম। এই তীব্র গতিতে বাতাস-সমুদ্র ভেদ করে যাবার সময় বাতাসের বাধায় যে মারাত্মক তাপ উৎপাদন হবে, তার ফলে উল্কাপাতের মত আমাদের "রকেট" কিম্বা আকাশ-যানটি জ্বলে পুড়ে ছাই হয়ে যাবেই। জ্বলে পুড়ে না গিয়ে যদি চলি শান্ত সংযত গতি নিয়ে, তবে বাজি ভোর হয়ে যাবে—যুগ কেটে যাবে। সময় যদি অত লাগে রসদ লাগবে এক গাদা। শূন্য আকাশ-পথে অত রসদ জোগাবে কে? পৃথিবী থেকে অনেক উঁচুতে, বাতাস যেখানে খুব পাতলা নামমাত্র, সেখানে এসেই উল্কাগুলো জ্বলে উঠে চোখ আমাদের ধাঁধিয়ে দেয়। পৃথিবীর কাছের বাতাস যেখানে গাঢ়, সেখানে প্রচণ্ড গতির আকাশ-যান রকেটের অবস্থা কি হবে তা সহজেই অনুমেয়। এই সমস্যা নিয়ে বহু গবেষণা হয়ে গিয়েছে।

পৃথিবীর ওপরে বাতাস যত আছে তার অর্দ্ধেক আছে পৃথিবীর গা থেকে তিন মাইল উচ্চতার মধ্যে। বাকী অর্দ্ধেক, তিন মাইল ওপর থেকে বহু উঁচুতে উঠে গেছে। যত উঁচুতে উঠেছে, বাতাস হয়েছে তত পাতলা। গাঢ় বাতাসের বাধা এড়াতে গেলে বেশ উঁচু পাহাড়ের ওপর থেকে রকেট-যাত্রা সুরু করা যুক্তিসঙ্গত। কিন্তু যে রকেট যাবে অন্য গ্রহে, তার আয়োজন নিশ্চয়ই এলাহি ব্যাপার। তাই লটবহর নিয়ে খুব উঁচু পাহাড়ে ওঠা, আর সেখান থেকে যাত্রা

সুরু করা একটা বিশেষ ব্যয়সাপেক্ষ ব্যাপার। তবু যতটা উঁচুতে ওঠা যায় ততই ভাল। আর একটা ব্যবস্থা করতেই হবে। সেটা হল রকেটের গতি নিয়ন্ত্রণ। বাতাসের স্তর ভেদ করার সময় গতি তার আয়ত্তের মধ্যে রাখতেই হবে। যত উঁচুতে উঠতে থাকবে সেটা, গতি তার ততই বাড়াতে হবে। বেশ কিছুটা ওপরে উঠে যাবার পরই দেখা যাবে সেখানের বাতাস খুবই পাতলা। সে বাতাসের বাধা তেমন বিপজ্জনক হবে বলে মনে হয় না।

এর পরই প্রশ্ন উঠবে, রকেটের মধ্যে মানুষ কি ঐ সাংঘাতিক গতি সহ্য করতে পারবে? মোটরে বেড়াতে গিয়ে ফাঁকা রাস্তায় গতি বাড়াতে বেশ মজা লাগে জানি। কিন্তু সে বেগ তো ঘন্টায় ৫০ থেকে ৬০।৬৫ মাইল। রকেটের গতি করতে হবে ঘন্টায় হাজার মাইলের বেশী। বাতাস স্তর ভেদ করে যাবার পর, সে গতি এমনকি ঘন্টায় ২৫০০০ মাইলেরও বেশী হতে পারে। ধীরে-সুস্থে অন্য গ্রহে যাবার চেষ্টা করা বাতুলতা। এই সাংঘাতিক গতি মানুষ সহ্য করতে পারবে কি?

খুব পারবে, রোজ পারছে! হৈ হৈ করে ওঠবার কিছু নেই। শোনোই না আমার বক্তব্য। বিষুব রেখার ওপর যে সব সহর সেখানের লোকেরা চব্বিশ ঘন্টায় ২৫০০০ মাইল ঘুরছে কিনা ভেবে দেখো। পৃথিবীর পরিধি বিষুব রেখার ওপর ২৫০০০ মাইল। পৃথিবীর দৈনন্দিন গতির সঙ্গে বিষুব রেখার ওপরকার সহরের লোকেরাও অজান্তে দিনে ২৫০০০ মাইল, বা ঘন্টায় হাজার মাইলের বেশী ঘুরছে। এ ছাড়া আরও ব্যাপার আছে। এক বছরে পৃথিবী প্রচণ্ড গতিতে সূর্যকে

একবার ঘুরে আসছে। সে গতির বেগ সেকেণ্ডে ১৮·৫ মাইল বা ঘণ্টায় ৬৬০০০ মাইল! পৃথিবী যখন এই প্রচণ্ড গতিতে ছুটে চলেছে, তখন তার মানুষগুলোকে তো আর সে ফেলে রেখে যায় না কোথাও! তাই তোমার, আমার, সকলেরই এই গতি রয়েছে আমাদের অজান্তে! অতএব বসেই থাকি আর শুয়েই থাকি, আমাদের গতি সাংঘাতিক! কথাটা কেমন কেমন শোনালেও, ভেবে দেখবার মত নয় কি? এই প্রচণ্ড গতির জন্য তবে আমরা জ্বলেপুড়ে ছাই হয়ে যাই না কেন? কারণ, পৃথিবীর সব কিছুই আমাদের সঙ্গে চলেছে। আমাদের চারপাশের বাতাস কেন, যা কিছু দেখছি সব কিছুই চলেছে ওই সাংঘাতিক গতিতে। তাই বাধা দেবার কথাই ওঠে না। কে কা'কে বাধা দেবে? সকলেরই যে একই গতি। রেশারেশি নেই—আগুপিছু নেই, সমান গতিতে সকলেই ছুটে চলেছি!

এইবার আসল কথায় আসা যাক। গতি যদি অপরিবর্তনীয় হয়, সে এক ব্যাপার। আর গতি যদি মুহূর্তে মুহূর্তে বদলাতে থাকে, সে আর এক ব্যাপার। গতির তারতম্য এলেই আমরা বলি গতি ত্বরণ (acceleration) কিম্বা মন্দন (retardation) হচ্ছে। গতির এই তারতম্য সহ্য করার ব্যাপারে মানুষের একটা সীমা আছে। প্লেনে যদি চড়ে থাকো, তাহলে নিশ্চয়ই এ অভিজ্ঞতা আছে। মাটির থেকে আকাশে ওড়বার সময় প্লেনখানার গতি খুব দ্রুত বাড়তে থাকে। প্লেনখানা আকাশ থেকে রানওয়েতে নামবার আগে গতি তার কমাতে থাকে। এইজন্যই প্লেনে করে আকাশে ওঠবার সময়

এবং নামবার সময়ই শরীরের মধ্যে অস্বস্তি লাগে। একই গতিতে যখন প্লেনখানা আকাশ পথে উড়ে যায়, তখন বোঝাই যায় না, যে ঘণ্টায় চার পাঁচ শো মাইল বেগে প্লেনখানা এগিয়ে চলেছে। ভারি মজা লাগে তখন।

কামানের গোলার মত আমাদের রকেটের গতি সুরু হতেই যদি সাংঘাতিক রকম বেশী হতে থাকে তাহ'লে তার মধ্যে মানুষের বেঁচে থাকা অসম্ভব। যত রকম আরামের কায়দাই রাখা যাক্ না কেন, গতির মারাত্মক ত্বরণে মানুষের মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী। বাতাসের বাধার জন্য রকেটের গতি হঠাৎ বাড়ানো যেমন সম্ভব হয় না, আরোহী নিয়ে যেতে হলে, তাদের নিরাপত্তার জন্যও তেমনি, গতি বাড়াতে হবে কায়দামাফিক। ত্বরণ বেশী হলে, মাথায় রক্ত উঠে মানুষ চোখে অন্ধকার দেখে, পরে অজ্ঞান হয়ে যায়। এরপরে মৃত্যু তো আসবেই। গতি যখন বাড়ছে, আরোহীদের শোয়া অবস্থায় কষ্ট হয় কম। এরজন্য নরম কুশানের ব্যবস্থা একান্ত প্রয়োজন। গতি যখন বাড়ে, তখন বাড়তি ভার লাঘব করবে এই নরম কুশানে। নিঃশ্বাসের কষ্ট কমানোর জন্য আলাদা অক্সিজেনের ব্যবস্থাও রাখতে হবে।

পৃথিবী যে শক্তি দিয়ে তার আশে পাশের সব জিনিসকে টানছে, তাকেই বলি মাধ্যাকর্ষণ। মহাশূন্যে পাড়ি দিতে হলে এই মাধ্যাকর্ষণের বিরুদ্ধাচারী হতে হবে আমাদের। অন্য গ্রহ-উপগ্রহে যেতে হলে এই শক্তিকে জয় করতেই হবে। যেখানে এই মাধ্যাকর্ষণ আর থাকবে না, সেই শূন্য আকাশে কোন রকমে চলে যেতে পারলেই বুঝি সব সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে ভেবেছো? মোটেই না। বরং আর

এক বিড়ম্বনা স্থরু হবে। জলের প্রয়োজন বোঝা যায় বেশী, যখন পুকুর ডোবা কূয়া সব শুকিয়ে যায় কিম্বা কলকাতা কর্পোরেশনের জলের কলে 'স্ট্রাইক' হয়। মাধ্যাকর্ষণ যখন না থাকে, তখনই এই শক্তির আবশ্যকতা উপলব্ধি করি। মাধ্যাকর্ষণ আছে বলেই, আমাদের ওজন আছে, এটা তোমরা সকলেই জানো বোধহয়। পৃথিবী থেকে যত দূরে যাবো আমরা, মাধ্যাকর্ষণও তত কমতে .থাকবে। কমতে কমতে যখন আর থাকবে না একেবারেই, আমাদের ওজনও তখন কমতে কমতে একেবারেই উপে যাবে! তাতে ক্ষতি কি? নিজেই একবার চিন্তা করে দেখো অবস্থাটা! রকেটের মধ্যে আর দাঁড়ানো বা বসা চলবে না তখন। যেখানে সেখানে রকেটের মধ্যে ভেসে বেড়াতে হবে। শুধু রকেট-আরোহীদের নয়, রকেটের মধ্যে যা কিছু থাকবে, সব কিছুরই অবস্থা হবে একই রকম। পাতে খাবার থাকবে না, গেলাসে জল থাকবে না, কাপে চা থাকবে না! হাত থেকে কিছু পড়ে গেলে, তা খুঁজতে হবে আশে-পাশে-ওপরে-নীচে! এই সঙ্গিন অবস্থার সমাধান বৈজ্ঞানিকেরা ভেবে রেখেছেন। তাঁরা বলেছেন, রকেট প্লেনখানার মেজেটার একটা চৌম্বকীয় (magnetic) শক্তি রাখতে হবে। আর আরোহীদের জুতার তলায় লাগাতে হবে লোহার প্লেট। পায়ের নীচের দিকে একটা টান তাহলে সব সময়ই আরোহীরা পাবে। আরও একটা সমাধান আছে। মাধ্যাকর্ষণ যখন থাকবে না, তার বদলে কেন্দ্রাতিগ টান (centrifugal force) ব্যবহার করা যেতে পারে। কোন কিছু ঘুরতে থাকলে, কেন্দ্রের দিকে তার একটা টান থাকে, এই শক্তিকে স্থবিধামত ব্যবহার করলে

সমস্যাটার সমাধান সম্ভব হতে পারে। রকেটটিকে তার অক্ষের ওপর খুব জোরে ঘোরালে কিন্তু আরোহীদের মাথা ঘুরে অন্ধকার দেখবে তারা! তাই রকেটটি তৈরী করতে হবে ছ'ভাগে। একভাগে থাকবে আরোহীরা এবং তাদের রসদ ও যন্ত্রপাতি, আর একটিতে থাকবে রকেটের ইঞ্জিন এবং তার আনুষঙ্গিক মালপত্তর। শূন্য আকাশে চলে যাবার পর রকেটটি ভাগ হয়ে যাবে ছ'ভাগে—বন্ধন থাকবে তাদের মধ্যে একটা শক্ত স্টীলের তার। জেট ইঞ্জিনের শক্তি দিয়েই এদের ভাগ করে ফেলতে হবে। পরে আলাদা ছোট ছোট ইঞ্জিন চালিয়ে একটি ভাগ আর একটি ভাগের চারদিকে ঘুরতে থাকবে। স্টীল তার দিয়ে বাঁধা থাকবে বলে, পরস্পর এ ওর চারপাশে ঘুরতে থাকবে নাগর-দোলার মত। এই ঘোরানো ইচ্ছামত কমিয়ে-বাড়িয়ে মাধ্যাকর্ষণের বদলি-শক্তির সৃষ্টি হবে! মাধ্যাকর্ষণের মধ্যে ফিরে এলেই এই 'নাগর-দোলা' বন্ধ করে দিলেই হবে। রকেটের ছ'ভাগ একত্র হয়ে মিশে গেলেই এই 'নাগরদোলা' বন্ধ হবে এবং রকেটের রূপ আগের মত হয়ে যাবে। এই জটিল কায়দায় ঝামেলা-ঝঞ্ঝাটের অন্ত নেই, কিন্তু মাধ্যাকর্ষণের লুপ্তি ঘটলেই এ ধরনের অভিনব ব্যাপার একটা কিছু করতেই হবে। তা না হলে রকেটে করে শূন্য আকাশে মানুষের পাড়ি দেওয়া একরকম অসম্ভব হয়ে দাঁড়াবে।

রকেটকে অন্য গ্রহ-উপগ্রহের দিকে ছুটিয়ে দিয়েই আমরা তো আর হাত গুটিয়ে বসে থাকতে পারি না। মহাশূন্যে আরোহীদের কি হল না হল, তাদের আশ্চর্য অভিনব অভিজ্ঞতার কথা তো জানতে হবে আমাদের। তাই রকেট যত দূরেই চলে যাক না কেন, তার সঙ্গে

খবরাখবর আদান-প্রদান রাখতেই হবে। এটা সম্ভব হবে বেতার মারফতই, তা বোধহয় আর বলে দিতে হবে না। শূন্য আকাশে চলে যাবার পরেও রকেটের সঙ্গে পৃথিবী থেকে বেতার যোগাযোগ রাখা সম্ভব হবে কিনা শেষপর্যন্ত, তা সঠিক বলা শক্ত। এ নিয়ে গবেষণা চল্‌ছে। এরপর সমস্যা হল, শূন্য আকাশ। এই অসীম অনন্ত আকাশ আমাদের কাছে চিররহস্য হয়ে আছে। এর ইতিবৃত্ত আমরা সঠিক জানি না এখনও। আমরা সূর্যের যে স্বভাব পৃথিবীতে দেখি এবং অনুভব করি, তার রকমফের মহাশূন্য আকাশে অবশ্যম্ভাবী। আমরা পৃথিবী থেকে সূর্যের যে স্বভাব দেখি, তা আমাদের বাতাস-সমুদ্রের "চালুনি" দিয়ে ছাঁকা যেন। তাতে বহু কিছু নেই। সেই "বহুকিছু" যা পৃথিবীতে এসে পেঁছচ্ছে না, তাদের কার্যকলাপ কেমন, কে বলবে?

আকাশে যে অজস্র উল্কা আছে, তাদের সঙ্গে আমাদের রকেটের ধাক্কা লাগবার সম্ভাবনা কতখানি? উল্কাগুলো আকারে খুবই ছোট্ট। বেশীর ভাগ উল্কাই ছোট ছোট নুড়িপাথরের মত, এমন কি বালুকণার মতও অনেক উল্কা আছে। বড় উল্কা যে নেই তা নয়, তবে তাদের সংখ্যা বেশী হলেও আকাশে মহাশূন্যতা এমনই বিরাট যে, কোন উল্কার সঙ্গে আমাদের রকেটের ধাক্কা লাগা একরকম অসম্ভবই। তবে আশঙ্কা যে একেবারে নেই সে কথা কেউ বলতে পারেন না। গ্রহ-উপগ্রহে যারা পাড়ি দেবেন, তাঁদের কাছে এটুকু বিপদ ধর্তব্যের মধ্যেই নয়।

চন্দ্র অভিযান সফল হয়েছে। মানুষ চাঁদের মাটিতে নেমেছে এবং

আবার পৃথিবীতে ফিরে এসে তাঁদের অভিজ্ঞতার কথা আমাদের জানিয়েছেন। শুধু যন্ত্রপাতি নিয়ে গবেষণার জন্য Viking I এবং Viking II ১৯৭৬ সালে মঙ্গলগ্রহে অবতরণ করে বহু কিছু বৈজ্ঞানিক তথ্য বেতারে এবং T.V.-তে আমাদের পৃথিবীতে পাঠিয়েছে।

এমনি করে খুঁটিনাটি আরও কত কি ভেবেচিন্তে তবেই না মঙ্গলগ্রহের উদ্দেশ্যে যাত্রা হবে সুরু। তাই সময় কিছু লাগবেই। তবে সম্ভাবনার কথা অস্বীকার করবার উপায় নেই আর। বৈমানিকেরা উঠে পড়ে লেগেছেন। সঙ্কল্প তাঁদের দৃঢ়। প্রচেষ্টা তাঁদের সার্থক হোক্। সফল হোক্ তাঁদের সাধনা। আমরা বড় তাজ্জব যুগে জন্ম নিয়েছি। কোন্‌দিন হঠাৎ শুনবো, অনন্ত অসীম আকাশে মঙ্গলগ্রহের উদ্দেশে আমাদের পৃথিবীর বৈজ্ঞানিকেরা যাত্রা করেছেন সুরু!

তাজ্জব প্লেন

আমাদের পাশের বাড়ির পরেশবাবুর মাথা খারাপ ছিল। মানে, মাঝে মাঝে তাঁর মাথা খারাপ হয়ে যেতো। কখন যে তাঁর এই অসুখ বাড়তো তা জানা যেতো না। এমনি বেশ ভাল থাকতেন। হঠাৎ কখন যে কি হোতো কেউ জানতেও পারতো না। একদিন তুপুরবেলা দোতলার বারান্দা থেকে রেলিং টপ্‌কে তিনি আকাশের দিকে তাকিয়ে চেঁচিয়ে উঠলেন, "ইফ্‌ বার্ডস্‌ ক্যান্‌ ফ্লাই, হোয়াই কানট্‌ আই।" তুটো হাত পাখির ডানার মত ছড়িয়ে দিয়ে লাফিয়ে রাস্তার ওপর দড়াম করে পড়লেন। সে একেবারে যাচ্ছেতাই কাণ্ড। মাথা ফেটে রক্তারক্তি ব্যাপার। হাসপাতালে নিয়ে যেতে যেতেই মারা গেলেন তিনি।

এ তো হল পাগলের পাগলামী। কিন্তু বুদ্ধিমান স্বাভাবিক মানুষেরও বহুদিনের বিশ্বাস ছিল, হাতে পাখা বেঁধে পাখির মত মানুষ বুঝি আকাশে উড়তে পারবে। চেষ্টাও করেছিলেন বহু বিজ্ঞানী বৈমানিক। ফল হয়েছিল ভয়াবহ, ওই পরেশবাবুর মতই। উড়তে তাঁরা কোন দিনই পারেননি। ওড়বার চেষ্টা করার সঙ্গে সঙ্গে মাটিতে পড়ে হাত-পা ভেঙেছেন অনেকে, প্রাণ হারিয়েছেন আরও অনেকে। পরে তাঁরা বুঝেছিলেন, পাখির মত আকাশে ওড়া মানুষের

পক্ষে বোধহয় সম্ভব হবে না। যুক্তি দিয়ে তাঁরা নিজেদের বুঝিয়েছিলেন, মানুষের দেহের যা ওজন, সেই অনুপাতে আকাশে ভেসে থাকার জন্য পাখা নাড়তে গেলে যে শক্তির প্রয়োজন, তা তাদের শরীরে নেই। হবেও না কোনোদিন। পাখির তা আছে। দেড় মণ ওজনের একটা মানুষকে পাখা নেড়ে আকাশে ভেসে থাকতে গেলে, কুড়ি ফিট্ লম্বা পাখা যে শক্তিতে ঝাপ্টাতে হবে, সে শক্তি জগতের কোন মানুষের ছিল না, হবেও না। তাই হাতে পাখা বেঁধে পাহাড়ের চুড়ো বা অন্য কোন উঁচু জায়গা থেকে লাফিয়ে পড়ে, ওড়বার চেষ্টা করলেই মাটিতে আছাড় খেয়ে তাকে পড়তেই হবে। এভাবে আকাশে ওড়বার চেষ্টা করা বাতুলতা ছাড়া আর কিছু নয়।

পাখির মত মানুষ যে আকাশে উড়তে পারতো না এ অক্ষমতা সে জয় করেছে বুদ্ধির জোরে। বাতাসের চেয়ে ভারি আকাশযানকে আকাশে ভাসিয়ে রাখার উপায় উদ্ভাবন করেছে সে এরোপ্লেন আবিষ্কার করে। তারই মধ্যে চড়ে সে আকাশপথের যাত্রী হয়েছে। কিন্তু এতে ইঞ্জিনের সাহায্য নিতে হয়েছে। ইঞ্জিনশক্তি দিয়ে প্রপেলার ঘুরিয়ে কিম্বা জেট্-ইঞ্জিন চালিয়ে প্লেনখানাকে আকাশে ওড়াবার ব্যবস্থা হয়েছে।

কথা হল, এই ইঞ্জিন শক্তি বিনা বাতাসের-চেয়ে-ভারি আকাশযানে মানুষের কি আকাশে ওড়া কোনোদিনও কোন উপায়ে সম্ভব হবে না? উনিশ শো পঞ্চাশ দশকের শেষ দিকে এই প্রশ্ন নিয়ে বিজ্ঞানীরা এবং বৈমানিকের আবার ভাবতে সুরু করলেন।

একদল বললেন, পাখিদের মত পাখা না নেড়ে, এরোপ্লেনের মত

ডানা রাখো। নিজে ওই আকাশযানে চড়ে প্যাডেল করো সাইকেলের মত। প্যাডেল করে শক্তি যা পাওয়া যাবে তারই জোরে প্রপেলার ঘোরাও। এতেই পাইলট নিজেকে ও তার আকাশযানটিকে ঠিক ভাসিয়ে রাখতে পারবে।

আকাশযানের কাঠামো ভেবে-চিন্তে অঙ্ক কষে সেইমত করে দেখতে হবে। অনেক বৈজ্ঞানিক সোসাইটি, অনেক কারিগরী ইন্‌স্টিটিউশনের গবেষণাগারে এই নিয়ে গবেষণা করে যে প্রযুক্তিবিদ্যা পাওয়া গেল তাই থেকে এক বছর ধরে খেটেখুটে "Gossamer Condor" তৈরী হল। খুব হালকা অ্যালুমিনিয়াম টিউব, পিয়ানোর স্টিল তার, প্লাস্‌টিক ফিল্ম, হাল্‌কা বিশেষ ধরনের কার্ডবোর্ড, সেলোফেন টেপ, এইসব দিয়ে যথাসাধ্য হালকা অথচ মজবুত করে তৈরী হল এই তাজ্জব প্লেন। এর ডানা করা হল ২৯ মিটার দীর্ঘ। মানে প্রায় একশো ফিট্। পাইলট বসার যে চৌকো ছোট্ট ঘরখানা তা হল পাতলা ফিনফিনে প্লাসটিকের চাদর দিয়ে তৈরী। এই ছোট্ট ঘরখানার ঠিক পিছনেই রাখা হল চার মিটার দীর্ঘ হালকা প্রপেলার। সাইকেলের মত পাইলট প্যাডেল করবে তাতেই এই প্রপেলার ঘুরবে। ঘরটার সামনেই সাড়ে চার মিটার লম্বা একটা খুব হালকা টিউবের মুখে থাকবে ছোট্ট আরও একজোড়া পাখনা, যাকে বলা হয় ক্যানার্ড (canard)। এই ছোট্ট পাখনাটিকে স্টিলের তার দিয়ে পাইলট কনট্রোল করবে। তাতেই এই প্লেনের উচ্চতার হেরফের হবে। ডাইনে বাঁয়ে বেঁক নেওয়ার ব্যবস্থাও এই পাখনা দিয়েই করা চলবে। একশো ফিট্ লম্বা পাখনাটা হল প্লেনখানাকে আকাশে

ভাসিয়ে রাখার জন্য।

তৈরী হল তাজ্জব প্লেন। বহু টেস্ট ফ্লাইটের পর ২৩শে আগস্ট ১৯৭৭ সালে অ্যামেরিকার ক্যালিফোরনিয়াতে এই প্লেন আকাশে উড়লো প্রায় সাড়ে সাত মিনিট!, মাটি থেকে দশ বারো ফিটের বেশী অবশ্য এই প্লেন কখনই ওপরে উঠতে পারেনি। তা হোক্, কিন্তু তবু তো মানুষ নিজের শারীরিক শক্তি দিয়ে আকাশে উড়তে পেরেছে! হৈহৈ রৈরৈ পড়ে গেল।

১৯৭৮ সালের অক্টোবর মাসে হেনরী ক্রেমার নামে এক ভদ্রলোক এক কাণ্ড করে বসলেন। ষোলো লাখ টাকার একটি প্রাইজ ঘোষণা করলেন। বললেন, এই ধরনের প্লেনে যিনি ইংলিশ চ্যানেল প্রথম পাড়ি দিতে পারবেন, তাঁকেই এই পুরস্কার দেওয়া হবে।

নূতন উৎসাহ ও উদ্যম নিয়ে এই ধরনের প্লেন তৈরী করা শুরু হল। উদ্যোক্তা হলো Du Pont Company। প্লেনখানার নাম হল, Gossamer Albatross। আগের প্লেনখানার ওজন ছিল বত্রিশ কিলোগ্রাম। কমিয়ে এটার করা হল পঁচিশ কিলোগ্রাম। সমুদ্রের ওপর দিয়ে প্রায় তিরিশ কিলোমিটার পথ পাড়ি দিতে সময় লাগবে প্রায় আড়াই ঘণ্টা। নটখটির শেষ নেই। অনেক যত্ন করে, অনেক খেটেখুটে শেষপর্যন্ত তৈরী হল এই তাজ্জব প্লেন। কিন্তু আড়াই ঘণ্টার ওপর একটানা জোরে প্যাডেল করে কোন্ পাইলট্ চালাবে এই প্লেনটিকে?

পাওয়া গেল পাইলট। বায়োকেমিস্ট ব্রায়ান অ্যালেন হলেন চব্বিশ পঁচিশ বছরের যুবক। চমৎকার গ্লাইডার পাইলট। আর

সবচেয়ে যা প্রয়োজন তা এই ব্রায়ান অ্যালেনের আছে। খুব সাইকেল চালাতে পারেন তিনি। বহু সাইকেল রেসে অনেক ট্রফি তিনি জিতেছেন। ঠিক হল, ব্রায়ান অ্যালেনই হবেন এই প্লেনের পাইলট।

১৯৭৯ সালের মে মাসের মাঝামাঝি ইংলিশ চ্যানেলের ধারে Folkestone নামে একটি জায়গায় প্লেনখানাকে আনা হল। এইখান থেকেই ইংলিশ চ্যানেল পাড়ি দেবার সুবিধা। কিন্তু শান্ত আবহাওয়ার জন্য অপেক্ষা করতে হবে। এলোমেলো ঝোড়ো বাতাসে এ প্লেন একেবারে অচল। বাতাসের বেগ ঘণ্টায় দশ মাইল থাকলেও এ প্লেনকে আয়ত্তে রাখা শক্ত হয়ে পড়ে। প্লেনটিকে একটি হ্যাঙ্গারে রেখে শান্ত আবহাওয়ার জন্য অপেক্ষা করতে লাগলেন পাইলট। একটার পর একটা দিন কেটে গেল, আবহাওয়াবিদ্‌রা অনুকূল আবহাওয়ার ভরসা দিলেন না। শেষে ১১ই জুনের আবহাওয়ার পূর্বাভাসে জানা গেল, চ্যানেল দু'তিন দিন খুব শান্ত থাকবে। সত্যই বায়ুর গতি তখন নেই বল্‌লেই চলে।

রাত তখন আড়াইটে। ১২ই জুন আরম্ভ হয়ে গিয়েছে। সুরু হয়ে গেল তোড়জোড়। প্লেনটিকে হ্যাঙ্গার থেকে টেনে বার করা হল। একটার পর একটা প্রস্তুতি চল্‌লো। এমন অনুকূল আবহাওয়া আর পাওয়া যাবে না। ভোর পাঁচটা ছটা নাগাদ রওনা হতেই হবে।

সমস্ত কিছু রেডি হবার পর পাইলট ব্রায়ান অ্যালেন প্লেনটির ভেতর নিজের জায়গায় গিয়ে দাঁড়াল্লেন। ২৯ মিটার দীর্ঘ ডানার

ছুদিকে ছুজন ধরে প্লেনটিকে এগিয়ে চললেন—পাইলট প্যাডেল করা সুরু করলেন। প্রপেলার ঘুরতে লাগল। প্লেনখানা মাটির ওপর দিয়ে ধীরে ধীরে এগিয়ে চললো। গতি কিছুটা বাড়তে, ডানা-ধরা লোক ছুজন ছুটতে লাগলেন প্লেনের ডানা ছুটোকে মাটির সাথে সমান্তরাল রেখে। ঠিক পাঁচটা বেজে একান্ন মিনিটে প্লেনখানা মাটি ছেড়ে আকাশে ভাসলো। আন্দাজ পনেরো ফিট উঁচু দিয়ে আকাশযানটি ঘণ্টায় প্রায় পনেরো কিলোমিটার গতিতে ফ্রান্সের দিকে এগিয়ে চল্‌লো। প্রপেলার ঘুরে চলেছে মিনিটে প্রায় একশো বার। অ্যালেন প্যাডেল করেছেন একটানা, একই ছন্দে।

অ্যালেনের হাতঘড়িতে সওয়া সাতটা। অ্যালেনের মনে হল প্লেনটি তখন বোধহয় চ্যানেলের মাঝপথে। একটানা প্যাডেল করে ক্লান্ত হয়ে পড়েছেন তিনি। ঘামে সমস্ত শরীর তাঁর ভিজে গিয়েছে। দূর দিগন্তের দিকে তাকিয়ে আছেন তিনি। কোথায় তীর? জল, শুধু জল—চারিদিকে শুধু জল। পা আর তাঁর চলে না। সর্বশক্তি প্রয়োগ করে অ্যালেন প্যাডেল করে চলেছেন। প্যাডেল করা থামালেই ঝুপ্‌ করে সমুদ্রের ওপর পড়ে যাবে প্লেনটি। অ্যালেন মরিয়া হয়ে উঠলেন। এও যেন এক দূরপাল্লার সাইকেল রেস। দূর দিগন্তে তীর দেখা গেল। কিন্তু অ্যালেন ভাবলেন, আর বোধহয় তিনি শেষ রক্ষা করতে পারলেন না। দম তাঁর বন্ধ হয়ে আসছে। যথেষ্ট হাওয়া নেই তাঁর ওই প্লাস্টিক জ্যাকেটের ছোট্ট ঘরটির মধ্যে। অ্যালেন ভাবলেন, একবার শেষ চেষ্টা করে দেখবেন তিনি। তীর যখন দেখা গিয়েছে তখন—। নূতন উদ্যমে তিনি প্যাডেল চালাতে

লাগলেন। আর কিছুটা এগিয়ে যেতে পারলেই তো "কেল্লা ফতে।"

ফ্রান্সের সমুদ্রতীরে অনেক লোক জমায়েত হয়েছে। ছেলে বুড়ো সবাই। তাদের চিৎকার যেন অ্যালেন শুনতে পাচ্ছেন।...

রওনা হবার ছু ঘণ্টা উনোপঞ্চাশ মিনিট পরে, ঠিক আটটা বেজে চল্লিশ মিনিটে, ব্রায়ান অ্যালেন সমুদ্রের জল কোন রকমে পার হয়েই শক্ত বালির ওপর প্লেনটিকে নামিয়ে দিলেন।

বিমান ইতিহাসে এ আর এক স্মরণীয় দিন। মনে রাখার মত ঘটনা।

—



জন্ম : কলকাতা, ডিসেম্বর ১৯১৬।

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞানের স্নাতক। চার্টার্ড ইলেকট্রিকাল ইঞ্জিনিয়ার। লণ্ডনের ইন্‌স্টিটিউট্ অফ ইলেকট্রিকাল ইঞ্জিনিয়ার্সের ও আমেরিকার ইন্‌স্টিটিউট্ অফ রেডিও ইঞ্জিনিয়ার্সের মেম্বর। কেন্দ্রীয় সরকারের সিভিল এভিয়েশন ডিপার্টমেণ্টের বিভিন্ন বেসামরিক বিমানঘাঁটির প্রধান বেতার কর্মকর্তা এবং পরে কণ্ট্রোলার অফ কমিউনিকেশন। বর্তমানে অবসরপ্রাপ্ত।

'দেশ' পত্রিকায় ধারাবাহিক লেখা "দুঘণ্টা" (হায়দ্রাবাদ পুলিশ এ্যাকশনের পটভূমিকায়) পরে 'গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স' থেকে পুস্তকাকারে প্রকাশিত। শিশুসাহিত্যে 'আশুতোষ লাইব্রেরী' থেকে "বেতারের গল্প" ও "এরোপ্লেনের গল্প" এবং 'দেব সাহিত্য কুটীর' থেকে "সবই যখন অন্ধকার" প্রকাশিত।